Vol. 58 | No. 1-2 | 2023

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আবদুলরাজাক গুরনাহর দুটি উপন্যাস প্যারাডাইস এবং আফটারলাইভস

Volume	58
Issue	1-2
Year	2023
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Tarana Nupur
Published online	February 1, 2023
DOI	10.62328/sp.v58i1-2.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v58i1-2.3
Pages	৪৭-৭০
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা ॥ বর্ষ : ৫৮ ॥ সংখ্যা : ১-২ ॥ ফাল্গুন ১৪২৯ ॥ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

Check for updates

আবদুলরাজাক গুরনাহর দুটি উপন্যাস প্যারাডাইস এবং আফটারলাইভস

তারানা নুপুর*

সারসংক্ষেপ: আবদুলরাজাক গুরনাহ নোবেলজয়ী কথাশিল্পী। পূর্ব-আফ্রিকার ইতিহাস, জনপদ ও সংস্কৃতি তাঁর উপন্যাসের মূল বিষয়। উত্তর-ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আফ্রিকার মানুষের সামষ্টিক ও ব্যক্তি-অস্তিত্বের নানা সংকটকে তিনি বিভিন্ন উপন্যাসে নানা আঙ্গিকে শিল্পিত করেছেন। গুরনাহর উপন্যাসের অনেক চরিত্রই তাঁর জীবনের ভগ্নাংশের ধারক অথবা তাঁরই নানা প্রতিরূপ। কল্পনা ও বাস্তবানুভূতির অনুপাত যথাযথ হওয়ায় গুরনাহর উপন্যাসে একই ধরনের বিষয় বারবার বিভিন্নরূপে ফিরে আসলেও প্রতিবার তা নতুনত্ব লাভ করে। গুরনাহর প্রথম পর্যায়ের উপন্যাসে আফ্রিকার মানুষের শরণার্থী-জীবনের সংকটই অধিক গুরুত্ব পায়। কিন্তু শেষ পর্যায়ের উপন্যাসে গুরনাহ তাঁর অভিজ্ঞতার ভগ্নাংশগুলোকে জোড়া দিয়ে, অভিজ্ঞানের সারাৎসারকে অবলম্বন করে জন্ম দেন কিছু নতুন ধরনের উপন্যাস, যেগুলোতে আফ্রিকার দূরাশ্রয়ী অতীত ও বর্তমান সমন্বিত এবং সমস্ত অস্তিত্ব নিয়ে মুখরিত। এ উপন্যাসগুলো তাঁর পরিণত জীবন ও শিল্পবোধের স্বাক্ষর। দীর্ঘ উপনিবেশিত জীবন পেরিয়ে নব্যঔপনিবেশিকতার পরোক্ষ সাক্ষী তাঁর স্বদেশবাসী ঘনিষ্ঠ মানুষগুলোর জন্য অভিবাসী গুরনাহর অমূল্য উপহার এ উপন্যাসগুলো তাদের স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যতের 'অ্যালবাম'। গুরনাহর এমন দুটি জনপ্রিয় উপন্যাস *প্যারাডাইস* এবং *আফটারলাইভস*। উপন্যাস দুটি আখ্যান-বিন্যাস, চরিত্রায়ণ এং ভাষারীতিতেও পরস্পর-সম্পর্কিত ও পরম্পরাবাহী। এই দুটি উপন্যাসের নানা আন্তঃসম্পর্ক ও বিন্যাস এ আলোচনার উপজীব্য।

ভারত মহাসাগরের বুকে পূর্ব-আফ্রিকার ছোট্ট দ্বীপ জানজিবারে জন্ম নেয়া আবদুলরাজাক গুরনাহ (১৯৪৮-) বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে সহিংসতায় উন্মাতাল প্রিয় মাতৃভূমি ছেড়ে মাত্র আঠারো বছর বয়সে উদ্বাস্তুর মতো পাড়ি জমান ইংল্যান্ডে। নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে সেখানে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন ক্যান্টারবেরি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে। ইংল্যান্ড-অভিবাসী সাগরপারের সোয়াহিলি পুরুষ গুরনাহর স্মৃতিকাতর মন সর্বদাই খুঁজে ফিরেছে তাঁর শৈশবের বর্ণিল ও বিক্ষুব্ধ অতীত। নানা বিদেশি বণিক আর ঔপনিবেশিক লুঠতরাজের নির্মম শোষণ-শাসনে বন্দি স্বদেশের মানুষগুলোর মুক-বধির, নগ্ন-ভগ্নপ্রায়, ম্লান-মূঢ় মুখগুলো গুরনাহর পরবাসী নিঃসঙ্গ জীবনে জাগরূক ছিল সর্বদা। তাঁর প্রথম লেখা তিনটি উপন্যাস *Memory of Departure* (১৯৮৭),

* অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ

Pilgrims Way (১৯৮৮) এবং *Dottie* (১৯৯০)-র উদ্বাস্তু চরিত্রগুলোর মতোই তিনিও স্মৃতিসূত্রে চলে যান ফেলে-আসা আফ্রিকার সমুদ্রবেষ্টিত আরণ্যক জীবনের নানা সংকট-সংহতিতে। প্রায় বিশ বছর পর ১৯৮৪ সালে তিনি প্রথমবারের মতো প্রত্যাবর্তন করেন জন্মভূমির নিজ বাস্তুভিটায়। গভীরভাবে ভেবে দেখলে গুরনাহর এ পরাবর্তন তাঁর উপন্যাসের বিষয় ও উৎকর্ষে আনে এক অলক্ষ বিবর্তন। পরের পর্বের উপন্যাসে তিনি আগের চেয়ে অনেক বেশি স্বদেশ-সংশ্লিষ্ট, চিরবঞ্চিত স্বজাতির জীবনের ইতিহাস-স্বপ্ন-বাস্তবতার চিত্রণে আরো নিষ্ঠ ও প্রত্যয়ী। জানজিবার থেকে লন্ডন ফিরেই তিনি *প্যারাডাইস* (১৯৯৪) লিখতে বসেন। এ উপন্যাসে তিনি পাঠককে নিয়ে যান আফ্রিকার এক গভীর অরণ্যানী-জীবনের ভেতর, যেখানে শ্বাপদ ও স্বর্গছায়া, সংগ্রাম ও স্বপ্ন, বন্দিত্ব ও মুক্তি, বীভৎসতা ও বিস্ময় দুইই সমরূপ। জীবন সেখানে জঙ্গলের মতোই আদিম ও রহস্যময়। গুরনাহর চতুর্থ উপন্যাস *প্যারাডাইস* বুকার পুরস্কারপ্রাপ্ত হয় ১৯৯৪ সালেই।

৭ অক্টোবর ২০২১ সালে নোবেল-বিজয়ের আগে গুরনাহ লিখে ফেলেন আরো দুটি উপন্যাস *Admiring Silence* (১৯৯৬), *By the Sea* (২০০১) এবং তারপর একে-একে তিনি রচনা করেন *Desertion* (২০০৫), *The Last Gift* (২০১১), *Gravel Heart* (২০১৬) এবং *Afterlives* (২০২০)। *আফটারলাইভস* তাঁর দশম ও শেষ উপন্যাস। এ প্রবন্ধে আবদুলরাজাক গুরনাহর দুটি উপন্যাস *প্যারাডাইস* এবং *আফটারলাইভসের* সন্নিধি, পরম্পরা ও তুল্যমূল্য আলোচিত হয়েছে। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, কাহিনির বিন্যাস, চরিত্রের বিবর্তন ও দীর্ঘসূত্রিতায় উপন্যাস দুটি প্রায় অনবচ্ছেদ্য। এ উপন্যাসজোড়া পূর্ব-আফ্রিকার সমুদ্র-তীরের দীর্ঘ দিনের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, নৃতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক ও ভাষাতাত্ত্বিক জীবনাচরণের মহাকাব্যিক আধার। *প্যারাডাইসকে* কেন্দ্র করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ববর্তী সময়ের পূর্ব-আফ্রিকার জীবন এবং *আফটারলাইভসে* প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে শুরু করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং তার পরবর্তীকালে আফ্রিকার স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত পর্যন্ত প্রায় এক শতাব্দীজুড়ে প্রেক্ষাপট আবর্তিত। দুটি প্রজন্মের তীব্র সংকটময় ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর এ উপন্যাসযুগল। যদিও *প্যারাডাইস* গুরনাহর চতুর্থ উপন্যাস এবং *আফটারলাইভস* দশম ও অধুনাতম, তবু পূর্ব-আফ্রিকার অনতিহ্রস্ব ইতিহাসের রূপায়ণে এ দুটি উপন্যাসের গভীর সংযোগ ও আনুপূর্বিকতা যেন লেখকের স্বেচ্ছাভিপ্রায়। হয়তো *প্যারাডাইসের* পরিণতি দৃশ্য থেকে পাঠক-মনে যে অতৃপ্তি জমে ছিল, কিছু পরে হলেও তার অবসান ঘটানো এবং মহাযুদ্ধের বাস্তবতায় পূর্ব-আফ্রিকার ঔপনিবেশিক ভয়াবহতাকে বস্তুনিষ্ঠ ও বৈশ্বিক করে তোলাই ছিল উত্তর-ঔপনিবেশিক কথাসাহিত্যিক আবদুলরাজাক গুরনাহর শৈল্পিক দায়বদ্ধতা।

২.

প্যারাডাইস আবদুলরাজাক গুরনাহর বহুলপঠিত উপন্যাস। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ববর্তী সময়ে ভারত মহাসাগরের উপকূলে দক্ষিণ-আফ্রিকার জনপদে দাসপ্রথা ও আরবীয় কাফেলা-বাণিজ্য এবং জার্মান ঔপনিবেশিক শক্তির আগমনের প্রেক্ষাপটে রচিত এ উপন্যাস। জাতীয়তাবাদী চেতনা ও শৈল্পিক নিষ্ঠার সাথে লেখক এ উপন্যাসে আফ্রিকার আদিম জনপদ, ভূ-বৈচিত্র্য ও ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার একটি খণ্ড অংশের রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। কাফেলাদের বৈচিত্র্যময় ভ্রমণ ও বিচিত্র উপজাতির অদ্ভুত লোমহর্ষক জীবন চিত্রণের মধ্য দিয়ে একটি অভিন্ন সমাজসত্তাকে বিম্বিত করেছেন লেখক। *প্যারাডাইস* উপন্যাসটি ছয়টি অধ্যায়ে বিভাজিত। ইউসুফ নামের বারো বছরের একজন আফ্রিকান কিশোরের প্রায় পাঁচ বছরের জীবনাভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির প্রেক্ষাপটে রচিত উপন্যাসটি লেখকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণিত। নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে ইউসুফ চরিত্রের বিবর্তন, চিন্তন ও অনুভবের আলেখন লেখকের মূল উদ্দেশ্য হলেও উপনিবেশ-পূর্ববর্তী আফ্রিকার আর্থ-সামাজিক ইতিহাসও এ উপন্যাসে সমান গুরুত্বপূর্ণ।

পূর্ব-আফ্রিকার ছোট্ট শহর কাওয়াতে জার্মানদের তৈরি রেলওয়ে প্লাটফর্মে প্রচণ্ড খরায় শামিয়ানার নিচে দাঁড়ানো জার্মান পুরুষ ও মহিলা এবং তাদের মাথার উপর কালো ঈগল আঁকা পতাকা ইঙ্গিত করে যে জার্মানির উপনিবেশের একেবারে গোড়ার দিক থেকে অর্থাৎ, ১৮৮৪ সালের কাছাকাছি কোনো সময়ে *প্যারাডাইস* উপন্যাসের শুরু। প্রথম অধ্যায় 'প্রাচীর ঘেরা উদ্যানে' কানজু, কুরুশ আর আতরের গন্ধমাখা ধনী আরব-বণিক সৈয়দ সাহেব, যাকে ইউসুফ শুরুতে 'আজিজ চাচা' বলে সম্বোধন করে, তার কাছ থেকে নেয়া ঋণ শোধ করতে না পারায় ইউসুফকে বন্ধক রাখতে বাধ্য হয় তার বাবা। আফ্রিকায় দেনার দায়ে এ বন্ধকী-প্রথা বহু প্রাচীন। ছোট্ট শহরে কিপাণ্ডে খেলে বড় হয়ে ওঠা ইউসুফকে একদিন আজিজ চাচার হাত ধরে চলে যেতে হয় অচেনা শহর তানজানিকায়, যার বর্তমান নাম তানজানিয়া। উদ্যানে ঘেরা এক বাড়ির সামনের ছোট্ট দোকানে তার সাথে দেখা হয় সৈয়দ সাহেবের আরেক দাস খলিলের সাথে, যে তার প্রভুর দোকানের দেখাশোনায় নিয়োজিত ছিল। ইউসুফ জানতে পারে যে, খলিলও তার মতোই পিতার ঋণের দায়ে দাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধা। প্রকৃতপক্ষে, সুদূর কাল থেকেই পূর্ব-আফ্রিকায় আরবদের দাস বেচা-কেনার ঐতিহ্য প্রচলিত ছিল। আবদুলরাজাক গুরনাহ তাঁর আরেকটি উপন্যাস *বাই দ্য সিতে* (২০০১) আফ্রিকায় সেমেটিকদের এ কৃতঘ্নতার ইতিহাস বর্ণনা করেছেন অত্যন্ত সংহত শব্দচয়নে –

> শতাব্দীকাল ধরে নির্ভীক বণিক ও নাবিকেরা, নিঃসন্দেহে তাদের বেশিরভাগই বর্বর ও দরিদ্র, তারা বাৎসরিক-যাত্রা করত মহাদেশের পূর্ব দিকে উপকূলের প্রশস্ত অংশে, যা অনেক কাল আগেই মৌসুমী বায়ুপ্রাপ্তির জন্য প্রসন্ন ছিল। তারা সাথে নিয়ে আসত তাদের পণ্যসামগ্রী, তাদের ঈশ্বর এবং তাদের জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি; তাদের গল্প-গাথা, গান, প্রার্থনা এবং যৎসামান্য জ্ঞান, যা ছিল তাদের সাধনার রত্ন। এবং তারা এনেছিল তাদের ক্ষুধা ও

> লোভ, তাদের কল্পনা, মিথ্যা এবং ঘৃণা। তার কিছু কিছু সারাজীবনের জন্য পেছনে ফেলে রেখে, যা কেনা যায় বেচে-কিনে-ছিনিয়ে নিয়ে, এমনকি মানুষ পর্যন্ত কিনে, ধরে নিয়ে গিয়ে কিংবা নিজভূমিতে শ্রম বা অধঃপতনের জন্য বিক্রি করে রেখে চলে যেত। অন্তত সেই সময় উপকূলবাসী মানুষগুলো খুব কমই জানত যে তারা কারা ছিল, তবে তারা ভালোই জানত যে নিজেদের এবং মহাদেশে বহিরাগত জাতির মধ্যে তাদের ঘৃণীদের থেকে কী তাদের পৃথক করে দিয়েছিল [AbdulRazak, 2001: 15]।

ধীরে-ধীরে বিভিন্ন জাতের আরব দাস বেচা-কেনা ও বাণিজ্যসূত্রে বসবাস করতে শুরু করে আফ্রিকার পুর্ব প্রান্তে। আরব বণিক এবং সোহায়িলি ব্যাবসায়ীরা মোসাম্বা থেকে কাফেলা নিয়ে ভিক্টোরিয়া হ্রদ পেরিয়ে, কিলিমাঞ্জারো পর্বতের কোল ঘেঁষে কাটাঙ্গা পর্যন্ত বিস্তৃত বাণিজ্য পথে তাদের ব্যবসা চালাত। এ পথে বড় বড় কাফেলা-দল আফ্রিকার উপজাতিদের কাছ থেকে বিভিন্ন পণ্যের বিনিময়ে হাতির দাঁতের সওদা করত। বাণিজ্য সেরে আবার তারা শহরে ফিরে আসত। বাণিজ্যপথের আশে-পাশে বাড়ি এবং সামনে প্রশস্ত নান্দনিক বাগান বানিয়ে সুখে বসবাস করত এ আরব বণিকেরা। এভাবেই আফ্রিকার স্থানীয়দের কাছ থেকে তাদের বাণিজ্য হস্তগত করে তারা (Marsh & Kingsnorth, 1972: 69-74)। *প্যারাডাইসের* সৈয়দ সাহেব পূর্ব-আফ্রিকায় আরব-বণিকদের শেষ প্রজন্মের প্রতিনিধি। দাস-ব্যবসার সাথে সরাসরি যুক্ত না থাকলেও যে পূর্বসূরি আরবদের সে উত্তরাধিকার, তাদের দাস কেনা-বেচার মানসিকতা তার মধ্যে ছিল। প্রকৃতপক্ষে, সৈয়দ সাহেবের দাস-ক্রয়ের পদ্ধতিটি ভিন্ন। সে বন্ধকী পদ্ধতিতে ঋণগ্রস্তের কাছ থেকে তার ছেলে বা মেয়েকে নিয়ে যায় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে জীবদ্দশায় ঋণ শোধ করতে না পারায় তারা বণিকের সম্পত্তিতে পরিণত হয়। ফলে, সরাসরি দাস না হলেও এ উপন্যাসে ইউসুফ, খলিল বা খলিলের বোন মূলত পরাধীন এবং তাদের জীবন দাসত্বেরই নামান্তর। তানজানিকায় সৈয়দ সাহেবের প্রাচীর ঘেরা উদ্যান, বুড়ো মালী মিজি হামদানী এবং অন্তঃপুরবাসী মিস্ট্রেস ইউসুফকে কৌতূহলী করে। খলিলের সান্নিধ্য তাকে নতুন পরিবেশে অভিযোজিত হতে সাহায্য করে। খলিলের পাশে রাস্তায় শুয়ে গভীর রাতে দুঃস্বপ্নের মতো কিছু জান্তব কুকুরের সাথে লড়াই চলে ইউসুফের –

> কুকুরগুলো যেন তার বুকের ওপর দুই পা তুলে দিয়ে ইয়া বড় হা করে আছে আর লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার নরম শরীরের দিকে। এক রাতে সেগুলো লাফিয়ে কাছে চলে এল। (আব্দুলরাজাক, ২০২২: ৩৪)

লেখক অসাধারণ পরিচর্যা-কৌশলে উপন্যাসের এ অংশে ইউসুফের ভয় ও নিঃসহায়তাকে চিত্রিত করেছেন এবং স্বপ্নের মধ্যে তার এই শ্বাপদভীতি আমরা পরবর্তীকালে ফিরে আসতে দেখব *আফটারলাইভস* উপন্যাসের হামজা চরিত্রে।

দ্বিতীয় অধ্যায় 'পাহাড়ি শহরে' ইউসুফ সৈয়দ সাহেবের কাফেলা-বহরের সাথে চলে দুর্গম

পাহাড়ি অঞ্চলের দিকে। সে বহরের পুরোভাগে ঢাক-শিঙ্গা নিয়ে চলে বাদক-দল, চলে কাফেলা সর্দার, জিনিসপত্র বয়ে নেয়ার জন্য মুটের দল ও পাহারাদার, গোত্রবাসীদের সাথে কথা বলার জন্য একজন দোভাষীসহ প্রায় শ'খানেক মানুষ। বাণিজ্যযাত্রায় আরবীয় এবং সোমালীয় বণিকেরা যেখানে বিশ্রাম নেয়ার জন্য থামে, সেখানে হামিদ সুলাইমান নামক একজন স্থানীয় দোকানমালিকের বাড়িতে সৈয়দ সাহেবের নির্দেশে ইউসুফের অস্থায়ী বসবাস শুরু হয়। সেখানে সে ভারতীয় ও গ্রিক বণিকদের দেখতে পায়। কিছু উন্নাসিক ইউরোপীয় খামারির রহস্যময় ব্যবসার কথা জানতে পারে। তার সাথে পরিচয় ঘটে একজন ভারতীয় শিখ মেকানিক হরবংশ সিং ওরফে কালাসিঙ্গার সাথে। প্রকৃতপক্ষে, বিচিত্র জাতি-গোষ্ঠী-ধর্ম ও সংস্কৃতির মানুষের সমন্বয়ে আবাল্য দেখা আফ্রিকার একটি ছোট সংস্করণকে গুরনাহ তাঁর উপন্যাসের প্রেক্ষাপটরূপে নির্মাণ করেন। একইভাবে সমুদ্রতীরবর্তী অরণ্য-প্রকৃতিকে যেমন ইউসুফের কাছে মনে হয় স্বর্গের মতো, তেমনি সৈয়দ সাহেবের প্রাচীরঘেরা বাগানটিকেও মনে হয় সেই স্বর্গের ক্ষুদ্র প্রতিরূপ। এ ব্যক্তিগত স্বর্গ এবং বৃহৎ স্বর্গ উভয়ই লুণ্ঠিত হয় ইউরোপীয় দস্যুদের দ্বারা। আবার ইউসুফের ব্যক্তিগত দাসত্ব এবং আফ্রিকার ব্যষ্টিগত দাসত্বও এ উপন্যাসে নির্বিশেষ এবং অভিন্ন। গুরনাহর *প্যারাডাইস* উপন্যাসের নামকরণের সার্থকতা এ অন্তর্নিহিত প্রতীকময়তায়। বিশ্রামরত বণিকদের কাছে ইউসুফ শোনে ইউরোপীয়দের কথা। বণিকদের সত্য-কল্পনায় মেশানো ইউরোপীয়রা যেন অতিমানব –

> তারা এখন যেখানেই যায়, ইউরোপিয়ানরা তার আগেই সেখানে পৌঁছে গেছে। শুধু তাই নয়, তারা সেখানে সৈন্যও মোতায়েন করে ফেলেছে। তারা লোকজনদের বোঝায় যে, তারা তাদের রক্ষা করতে এসেছে।... একটা কড়ি না দিয়ে তারা সবচেয়ে ভালো জমিটা নিয়ে নিত। নানা কৌশলে তারা স্থানীয়দের তাদের কাজে খাটতে বাধ্য করত। শক্ত হোক, পচা-গলা হোক, সবই তারা খায়। মড়ক লাগানো পঙ্গপালের মতো তাদের খিদে কখনও মেটে না। লজ্জা-শরম বলতে কিছু নেই। এটার ওপর খাজনা, ওটার ওপর খাজনা। না দিলে তাকে ধরে বেত দিয়ে পেটায়, জেলে ঢোকায়, এমনকি ফাঁসিতে পর্যন্ত ঝোলায় তারা। তারা যেখানেই যায় প্রথমে বানায় একটা গারদ, তারপর একটা গির্জা, তারপর ছাউনি দেয়া একটা বাজার।... তারা যে কাপড়-চোপড় পরে তা সব লোহার তৈরি। অথচ তাতে তাদের গায়ে ঘষা লাগে না। তারা পানিটুকু না খেয়ে, একটুও না ঘুমিয়ে দিনের পর দিন চলতে পারে। তাদের থুথু বিষাক্ত।... কোনো ইউরোপীয় মরার পর দেহ নষ্ট হয়ে যাওয়ার বা পচতে শুরু করার আগে অন্য কোনো ইউরোপীয় সেখানে এলে তাতে প্রাণ ফিরিয়ে দিতে পারে। (আব্দুলরাজাক, ২০২২: ৭৬)

অরণ্যের অসূর্যম্পর্শা মানুষগুলোর কাছেও জার্মানমানব যেন রূপকথার কোনো অদ্ভুত, ভয়ঙ্কর দানব। পাহাড়ি শহরে বসবাসের শেষভাগে ইউসুফ ছিল ষোলো বছরের তরুণ (আব্দুলরাজাক, ২০২২: ৯২)। তারপর একটি বছর তার কেটে যায় মধ্যাঞ্চল সফর ও অরণ্য-গহীন গোত্র-জীবনে বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে।

'মধ্যাঞ্চল সফর' অধ্যায়ে সৈয়দ সাহেবের কাফেলা-দলের সাথে অংশগ্রহণ করে ইউসুফ। বুনো জানোয়ার, ধুলোর মেঘ, পোকার কামড়, সর্পিল অভয়ারণ্য পেরিয়ে তারা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে চলে সেই জনপদ স্বর্গের মধ্যস্থলে। 'অগ্নিশিখার সিংহদ্বার' অধ্যায়ে কাফেলা-যাত্রার তিন দিন পর ইউসুফ যে বিশাল শহরে এসে পৌছে, সে শহর বহু বছর আগে ওমান থেকে আসা শাসকেরা পত্তন করেছিল। জাঞ্জিবার থেকে মারঙ্গুর গভীর অরণ্য ও নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল সেই রাজ্য। দাসদাসী, গোলাম, হারেমের সুন্দরী আর অযুত ঐশ্বর্য নিয়ে সেই সব সুলতানের জীবন এখন কিংবদন্তি।

প্রকৃতপক্ষে, ওমানি শাসকদের বিস্তৃত ইতিহাস রয়েছে পূর্ব-আফ্রিকার গহিন অরণ্যাঞ্চলে। ইতিহাস অনুযায়ী, ১৮৮০ সালে ওমানি শাসক সায়্যিদ সইদ প্রথম তার শহর নিয়ে ওমান থেকে পূর্ব আফ্রিকার জানজিবারে চলে আসে। প্রচণ্ড খরা ও বালিমাটিযুক্ত এলাকা থেকে তারা চলে আসে জানজিবারের প্রশস্ত, সবুজ প্রান্তরে। তারা সেখানে এলাচির চাষ শুরু করে। শুধু উর্বর মৃত্তিকা এবং চাষাবাদ নয়, বাণিজ্যের জন্যও যথাযথ এ শহর। সমুদ্রতীর, পোতাশ্রয়, সুপেয় জল পেয়ে তারা সমুদ্রতীরবর্তী স্থানগুলোতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। রাজনীতিতে তাদের আগ্রহ ছিল না; বণিক এবং দাস-ব্যবসায়ী বলেই পরিচিত হয় তারা। সুলতান সায়্যিদের মৃত্যুর পর ওমানীয় স্বাধীন শাসকেরা দক্ষিণ-আফ্রিকার নানা শহরে তাদের রাজত্ব বিস্তার করে (Marsh & Kingsnorth, 1972: 69-72)। *প্যারাডাইস* উপন্যাসে মিয়েম্বা শহরের সুলতান টিপু টিপ এ ওমানি শাসকদের উত্তরসূরি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন সৈয়দ সাহেবের কাফেলা-বাহিনী সেখানে পৌছে, তখন সেখানে জার্মানরা রেলপথ বসাবার উদ্যোগ নিয়েছে। তাদের হুকুমের গোলাম তখন সে-সব সুলতানের অবশিষ্ট উত্তরপুরুষ। সুদের আশায় ওমানি বণিকদের ঋণ দেয়া মুক্কিরা ইন্ডিয়ানরাও তখন কিংবদন্তি। কাফেলা-সর্দার মোহাম্মদ আবদাল্লাহ বলে, 'ইন্ডিয়ানদের কখনো বিশ্বাস করো না। মুনাফা পেলে তারা তাদের মাকেও বেঁচে দিতে পারে' (আব্দুলরাজাক, ২০২২: ১৩২)।

ওমানিদের দেশ পেরিয়ে অলি-গলিভরা গোলকধাঁধার শহর তায়ারি এবং আরো বহু গ্রাম পেরিয়ে কাফেলা-দল পৌছে পাহাড়ে ঢাকা হ্রদের ধারে। হ্রদের ওপারে জংলি সুলতানদের ছোট ছোট শহর। জংলিদের ভাষা-বিশ্বাস-কুসংস্কার-সংস্কৃতি শহর থেকে ভিন্ন। তাদের কাছে জার্মানরা 'বিরাট লোক'। গোত্রের মানুষগুলো বিশ্বাস করে জার্মানদের মাথা লোহা দিয়ে তৈরি। সব শেষে প্রবল ঝড়ের কবলে পড়ে, 'পেম্বা' নামে এক আত্মাকে উপঢৌকন দিয়ে হ্রদ পেরিয়ে কাফেলা-দল পৌছে যায় কিলিমাঞ্জারোর কোলে, জংলি সুলতান চাটুর দেশে। কাফেলা দলের মধ্যে সুন্দর তরুণ ইউসুফকে জঙ্গুলেরা মনে করে সৌভাগ্যের প্রতীক। চাটু প্রথমে বিনয়ী আচরণ করলেও মাঝ রাতে ক্লান্ত বণিকের দল যখন ঘুমে আচ্ছন্ন, তখন তার দল হত্যা করে কাফেলা পাহারাদারদের – বেধড়ক পেটায় দলের সর্দার ও অন্য সবাইকে এবং লুঠ করে তাদের সকল পণ্য। চাটুর দল মনে করে

এ আরব বণিকেরা তাদের জন্য দুর্দশা বয়ে এনেছে, যেমন আগেও নানা বণিক তাদের ভাগ্য-বিপর্যয়ের কারণ হয়েছে। চাটুর ভাষায় –

> এখানে তোমাদের আসতে বলা হয়নি, আমরা তোমাদের স্বাগতও জানাইনি। তোমাদের উদ্দেশ্য ভালো নয়। তোমরা আমাদের জন্য খারাপ কিছু বয়ে এনেছ। তোমরা এখানে এসেছ আমাদের ক্ষতি করতে। তোমাদের আগে তোমাদের মতো আরও লোকজন এসে আমাদের ক্ষতি করে গেছে। অনেক ভুগেছি আমরা। আর ভুগতে চাই না। তারা আমাদের প্রতিবেশীদের সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। তারা তাদের আটকে রেখেছিল এবং তারা তাদের নিয়ে গেছে। তারা প্রথমবার আসলে আমাদের এখানে দুর্যোগ নেমে এসেছিল। তোমরাও এসেছ একইভাবে আমাদের দুর্ভোগ বাড়াতে। (আব্দুলরাজাক, ২০২২: ১৫৬)

আফ্রিকার পূর্ব-উপকূলের এ অন্ত্যজ জাতিগোষ্ঠীগুলোর উপর শতাব্দীকাল ধরে নানা অভিসন্ধি নিয়ে আরবীয়দের লুণ্ঠন-নিপীড়নের প্রতিশোধরূপে ইউসুফদের কাফেলা-দলের উপর নেমে আসে অবর্ণনীয় দুর্ভোগ। এরই মাঝে গোপনে ইউসুফ তার প্রথম যৌবনের স্বাদ গ্রহণ করে বুনো মেয়ে বটির সাথে শারীরিক মিলনের মাধ্যমে। চাটুর লোকজনের কাছে 'বিরাটলোক' বলে পরিচিত সেই জার্মান দল চলে আসায় কৌতূহলী, ভীত চাটু কাফেলাদের পণ্যসামগ্রীসহ ফেরত যাবার সুযোগ করে দিতে বাধ্য হয়। এ দৃশ্যটি মূলত প্রতীকীভাবে আফ্রিকার গভীর অন্ধকারের প্রান্তিক জনপদে জার্মান-অনুপ্রবেশ ও দখলদারিত্বের ইঙ্গিত দেয়। আফ্রিকার ঘন অরণ্যের মানুষের নিস্তরঙ্গ জীবন এতকাল ছিন্ন-ভিন্ন করেছে আরব-ওমান-পারস্য থেকে আসা বণিকেরা। তারপর তাদের সে স্বর্গকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করতে আসে নাৎসীবাহিনী।

পূর্ব-আফ্রিকার মানচিত্রায়ণ, ভ্রমণ-অভিযাত্রা এবং জার্মান-ঔপনিবেশিকতার সূত্রে একজন সমালোচক জোসেফ কনরাডের *হার্ট অফ ডার্কনেস* (১৯৯৩) উপন্যাসের সাথে গুরনাহর *প্যারাডাইসের* সাদৃশ্য লক্ষ করে বলেন যে, উপন্যাসটি *হার্ট অফ ডার্কনেসের* উত্তরাধিকার (Jacob, 2009: 87)। বাণিজ্য-অভিযাত্রা এবং আফ্রিকার সমুদ্র-উপকূলের স্থানীয় পার্বত্য-বাসিন্দাদের সূত্রে এ উপন্যাসের কিছু সাযুজ্য থাকলেও *হার্ট অফ ডার্কনেসের* কাহিনি চার্লস মারলো নামের একজন ইউরোপীয় কর্তৃক বর্ণিত কিন্তু *প্যারাডাইস* লেখকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত। 'সাপের মতো ছড়িয়ে থাকা' নদীটিই *হার্ট অফ ডার্কনেসের* মূল যাত্রাপথ কিন্তু কাফেলা-যাত্রার সূত্রে *প্যারাডাইসে* সমতল ও পাহাড়ি অঞ্চলের বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে। আদিম নিসর্গ-স্বর্গের সবুজ-বেগুনি-নীলাভ আকাশ, পাহাড়ি হাওয়া, অপরূপ ঝর্ণাধারা আর নিবিড় স্রোতস্বিনীর বর্ণনাতীত সৌন্দর্যকে গুরনাহ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও প্রাণময় করে তুলেছেন তাঁর উপন্যাসে। জোসেফ কনরাডের উপন্যাসের তুলনায় *প্যারাডাইস* আরো অরণ্য-সঙ্কুল, পর্বত-বন্ধুর এবং রহস্যময় জীবন ও প্রকৃতির সৌন্দর্য ও বিভীষিকার বাহক। কাফেলা-যাত্রীদের সাথে গুরনাহ বিচরণ করেছেন সেই পথে। স্থানীয় অধিবাসী কার্টজের সূত্রে কনরাড আফ্রিকার গোত্র-জীবনে পৌঁছতে সক্ষম হলেও সে জীবনের সুখ-

দুঃখ, সংস্কার-ভয়-বিশ্বাস-আদিমতার সাথে গুরনাহর প্রত্যক্ষতা অনেক বেশি। কনরাড যে অন্ধকারের হৃদয়কে ছুঁয়ে দেখেছেন কেবল, গুরনাহ তাকে বিভাবিত করেছেন – তার তীব্রতা, তীক্ষ্ণতা ও অন্তরঙ্গতাকে অনুভব করেছেন। সর্বোপরি *হার্ট অফ ডার্কনেস* বিদেশি অভিযাত্রীর চোখে দেখা আফ্রিকা কিন্তু *প্যারাডাইস* সাগরপারে বেড়ে ওঠা সোয়াহিলি মানুষ গুরনাহর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত। তাঁর গভীর প্রত্নপ্রতিমায় সংরক্ষিত নানা উপাচারে নির্মিত *প্যারাডাইস*। বরং ভি. এস. নাইপলের *অ্যা বেন্ড ইন দ্য রিভার* (১৯৭৯) উপন্যাসের সাথে গুরণাহর প্যারাডাইজের তুলনাসূত্রে সমালোচক ফৌজিয়া মুস্তফার নিম্নোক্ত মন্তব্য অধিকতর প্রাসঙ্গিক – 'নাইপলের উপন্যাসটি যেমন রাজনৈতিক, বিপ্লবাত্মক, র‍্যাডিকেল এবং প্রতিক্রিয়ামূলক অবস্থান প্রকাশ করে, গুরনাহর উপন্যাসটি তেমন নয়। গুরনাহ রাজনৈতিক লেখক নন। কারণ তাঁর সাহিত্যকর্মে ন্যাশনালিজম, লিবারেলিজম কিংবা নিওলিবারেলিজমের প্রতিফলন দুর্লক্ষ। গুরণাহ্‌র উপন্যাসে বরং যৌথ-অবচেতনার উপাদান বেশি। নাইপল যেখানে ব্যক্তিকেন্দ্রিক, গুরনাহ সেখানে সমষ্টিচেতন।' (Fowzia, 2015 : 237-238) গুরনাহর রাজনীতিচেতনার সামূহিক প্রকাশ ঘটে তাঁর অধুনারচিত উপন্যাস *আফটারলাইভসে: প্যারাডাইসে* তাঁর অভীপ্সা ভিন্ন। গুরনাহর আবাল্য দেখা ও শোনা নানা অভিজ্ঞতার সারাৎসার, সত্তা-অনুভবের অকৃত্রিমতা ও প্রত্নপ্রতিমার গভীর উৎসারণ থেকে রচিত *প্যারাডাইস*। তার প্রমাণ দৃশ্যমান হয় উপন্যাসের পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ের কাহিনি-বর্ণনায় মুসলিম ঐতিহ্যের আত্তীকরণে।

প্যারাডাইসের পঞ্চম অধ্যায়ে বাণিজ্য শেষে ইউসুফ ফিরে আসে তানজানিকার সেই চেনা স্বর্গোদ্যানে, যেখানে বাগানঘেরা অন্তঃপুরে বাস করে সৈয়দ সাহেবের দুই স্ত্রী। লেখক ইসলামি ঐতিহ্যের ইউসুফ-জুলেখার কাহিনির আদলে রচনা করেন উপন্যাসের এ অংশটি। যদিও বাইবেলের যোসেফের কাহিনি প্রায় সমরূপ, তবু তানজানিকা মূলত মুসলিম-অধ্যুষিত হওয়ায় গুরনাহ সচেতনভাবে ইসলামি আবহ সৃষ্টির জন্যই কোরানের ইউসুফের কাহিনির প্রচ্ছন্ন আবরণ তৈরি করেন এ অংশে। কোরানে বর্ণিত ইউসুফ ছিল অসাধারণ রূপবান। সদাগরের কাছ থেকে কিনে যে উজির তাকে তার প্রাসাদে নিয়ে যায়, তার নাম ছিল আজিজ এবং আজিজ-পত্নীর নাম ছিল জুলেখা (মুহম্মদ এনামুল, ২০০৯: ৩৭)। এ উপন্যাসের আরব বণিকের নাম আজিজ, তার পত্নীর নাম জুলেখা এবং ইউসুফ অনিন্দ্য সুন্দর ও সৌভাগ্যের প্রতীকরূপে সবার কাছে আদৃত। *প্যারাডাইস* উপন্যাসে মিস্ট্রেস বা জুলেখার ছিল এক বিরল রোগ – তার বাম গাল থেকে ঘাড় পর্যন্ত ছিল বেগুনি লম্বা দাগ। জুলেখার মনে এ ভ্রান্ত বিশ্বাস জন্মে যে, সুদর্শন ইউসুফ তার চিবুকের ক্ষত স্পর্শ করলে তা নিখুঁত ও সুন্দর হয়ে উঠবে। অন্তঃপুরে আজিজের দ্বিতীয় স্ত্রী ও খলিলের বোন আমিনাও ইউসুফের মতোই ঋণের দায়ে পরাধীন। তার প্রতি করুণা ও আকর্ষণবশত ইউসুফ মিস্ট্রেসের আহ্বান উপেক্ষা করতে পারে না।

'জমাট রক্ত' নামে ষষ্ঠ অধ্যায়ে ইউসুফ আমিনা, খলিল ও নিজের বন্দিদশা থেকে মুক্ত হবার পরিকল্পনা আঁকে মনে-মনে। কিন্তু এক সন্ধ্যায় জুলেখার কামনাময় আহ্বানে সাড়া না দিয়ে সন্ত্রস্ত ইউসুফ পালিয়ে যেতে উদ্যত হলে সে পেছন থেকে তার শার্ট টেনে ধরে। ইউসুফের শার্ট পেছন থেকে ছিঁড়ে যায়। অনুরূপ ঘটনা ঘটে কুরানের ইউসুফের সাথেও। ইউসুফ-জুলেখার মূল কাহিনির পাঠকের কাছে এ ঘটনা সুপরিচিত এবং সে ঐতিহ্যময় কাহিনির সুদর্শন ইউসুফের মতোই তানজানিয়ার ইউসুফও কৈফিয়তে বলে, 'সে আমার শার্ট পেছন থেকে ছিঁড়ে দিয়েছে। আমি যে তার কাছ থেকে পালাচ্ছিলাম, এটাই তার প্রমাণ'। কোরানের ইউসুফ-জুলেখার সম্পূর্ণ কাহিনির বিনির্মাণ না হলেও গুরনাহর 'আর্কেটাইপ' থেকে উঠে এসে তার ভগ্নাংশ অত্যন্ত প্রাকৃতিকভাবে সমীভূত হয় উপন্যাসের ঘটনা ও চরিত্রের সাথে এবং এর নান্দনিক মর্যাদা বৃদ্ধি করে। উপন্যাসের শেষ অংশে আজিজ চাচার কাছেই ইউসুফ তার বাবার মৃত্যু সংবাদ পায় এবং সেই সাথে তার মুক্তির পথও চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। ফলে, অস্তিত্ব-সংকটের এ পর্যায়ে ইউসুফ দোকানের সামনে দেখা বিকৃতদর্শন জার্মান সার্জেন্টের পেছন-পেছন মার্চ করতে করতে চলে যাওয়া দেশীয় আফ্রিকানদের আসকারি সৈন্যদল লক্ষ করে ছুটতে শুরু করে। উপন্যাসটি এখানেই শেষ হয়। *প্যারাডাইসে* ইউসুফের এ অনির্দেশ্য যাত্রা পাঠকের মনে নানা সম্ভাবনার ইঙ্গিত এবং এক ধরনের অতৃপ্তি সঞ্চার করেছিল ১৯৯৪ সালে। বিশেষত, যারা উত্তর-ঔপনিবেশিক লেখক গুরনাহর ভক্ত, তারা *প্যারাডাইসের* দুয়েকটি দৃশ্যে জার্মান-আনাগোনা ও কেবল ইউসুফের কাফেলা-যাত্রায় তৃপ্তি বোধ করেননি। গুরনাহর দশম ও অধুনাতম উপন্যাস *আফটারলাইভসে* জার্মান-উপনিবেশের বিস্তৃত ও প্রত্যক্ষ প্রেক্ষাপট পাঠকের সেই অতৃপ্তি লাঘব করে। এ উপন্যাসে পূর্ব-আফ্রিকার সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক-সামাজিক-রাজনৈতিক পট ও জীবনপ্রবাহ গুরণাহর অদ্যাবধি লেখা সমস্ত রচনাকে একটি বিপুলায়তনিক বিন্যাসের সমগ্রতায় একীকৃত করে। সেই সাথে *প্যারাডাইসের* ইউসুফ চরিত্রটিই ভিন্ন নামে *আফটারলাইভসের* হামজা চরিত্রের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা লাভ করে। *প্যারাডাইসের* ইউসুফ এবং *আফটারলাইভসের* হামজা হয়ে ওঠে অভিন্ন সত্তার শিল্পিত রূপায়ণ। তাছাড়া, স্থান-কাল-প্রতিবেশ, ইতিহাস-সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতির পরিক্রমার দিক থেকেও দুটি উপন্যাসের ধারাবহ বিস্ময়কর।

৩.

আবদুলরাজাক গুরণাহর *আফটারলাইভস* পূর্ব-আফ্রিকার মানুষের উপনিবেশিত জীবনের এক মহাকাব্যিক গাথা। চারটি অধ্যায়ে এবং পনেরো পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত এ উপন্যাসের আখ্যান। *আফটারলাইভস* শুরু হয় তানজানিয়ায় গুজরাট থেকে আসা ছাব্বিশ বছর বয়স্ক খলিফা নামের এক ব্যক্তির সাথে আমুর বিয়াশ্রা নামক এক ভারতীয় বণিকের পরিচয়ের মধ্য দিয়ে। খলিফার মা আফ্রিকান হলেও তার বাবা কাশেম গুজরাটি মুসলমান। খলিফা আফ্রিকায় গুজরাটি বিয়াশ্রা ভ্রাতৃযুগলের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হিসাবরক্ষকের পদে যোগদান

করে। উপন্যাসে উপক্রমণিকার মতো করে সংক্ষেপে 'ফ্ল্যাশব্যাকে' গুরনাহ বর্ণনা করেন খলিফার বাবা-মায়ের বিয়ে, খলিফার শৈশব-কৈশোর ও ছাব্বিশ বছরের যাপিত জীবনের ঘটনাবলি।

খলিফা যখন পাঁচ বছরের জন্য তার শিক্ষাগুরুর কাছে হিসাবরক্ষণ জ্ঞান আয়ত্ত করছিল, তখন আরব এবং ওয়াসওয়াহিলি অর্থাৎ পূর্ব-আফ্রিকার বান্টু জাতিকে হটিয়ে তানজানিয়া ও জানজিবারে অনধিকারপ্রবেশ করে জার্মানরা। বাণিজ্যসূত্রে আফ্রিকায় অভিবাসী ওমানীয় নেতা আলবুশিরি আফ্রিকান ক্ষুদ্রগোত্রসমূহ এবং আরবীয়দের নিয়ে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে জার্মানদের বিপক্ষে। ততদিনে জার্মান সেনারা আফ্রিকার স্থানীয় সৈন্যদের ট্রেনিং দিয়ে আসকারি-বাহিনী তৈরি করে। জার্মানদের নেতৃত্বে আসকারিরা নিজ গোত্রসমূহ এবং ওমানিদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়। ১৮৮৮ সালে ওমানি বিপ্লবী নেতা আল বুশিরিকে জনসম্মুখে গলায় ফাঁসি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়। জার্মানরা রক্তপাত ঘটনোর মাধ্যমে ক্রমশ পূর্ব আফ্রিকার বাগামোয়োর দিকে ধাবিত হয় (AbdulRazak, 2021: 7-8)। খলিফার দশটি বছর কেটে যায় বিয়াশ্রাদের ব্যাংকে। বাবা-মায়ের মৃত্যুর পর নিঃসঙ্গ খলিফার সাথে নিজ বোনের মেয়ে বিআশাকে বিয়ে দিয়ে আমুর বিয়াশ্রা ঋণের দায়ে বন্ধক রাখা তাদের বাড়িটি আত্মসাৎ করে।

প্যারাডাইসে শতাব্দী-পুরনো যে আরব-ওমানি ব্যবসার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করা যায়, পূর্ব-আফ্রিকার সেই অর্থনৈতিক উপনিবেশের ধারাবহিকতার চিত্র অঙ্কিত হয় *আফটারলাইভস* উপন্যাসে গুজরাটি ব্যবসার নতুন পরিসরে। এ উপন্যাসে আমরা দেখি আরবদের বাগানবাড়ি-দোকান দখল করে নেয় ভারতীয়রা। এক জন ঐতিহাসিক বলেন যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বহু গুজরাটি পূর্ব-আফ্রিকায় এসে ব্যবসার মধ্য দিয়ে তাদের ভাগ্য বদল করে। তাদের অনেকেই সুপ্রতিষ্ঠিত হয় ব্যবসা কিংবা ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, অনেকেই দশ বছরের মধ্যে দেউলিয়া হয়ে দেশে ফিরে আসে। কেউ কেউ আফ্রিকায় প্রতিষ্ঠিত গুজরাটিদের দোকানে কাজ নেয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকেই এই ভারতীয় ব্যবসায়ীদের অনেকে জানজিবার এবং এর আশে-পাশে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে (Gijsbert , 2005: 2077)। *আফটারলাইভস* উপন্যাসের বিয়াশ্রা ভাতৃদ্বয় ও তাদের উত্তর প্রজন্ম নাসোর বিয়াশ্রা এবং খলিফা এ বিস্মৃত ভারতীয় ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি। ১৯৬৪ সালে জানজিবার বিপ্লবের[১] পূর্বকাল পর্যন্ত ব্রিটিশদের পৃষ্ঠপোষকতায় আফ্রিকায় এ ভারতীয় ব্যবসায়ীদের অর্থনৈতিক উপনিবেশ বলবৎ থাকে।

অর্থনৈতিক ক্রমবিকাশ ছাড়াও গুরনাহ পূর্ব-আফ্রিকার ইতিহাসের প্রায় প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় চরিত্র ও ঘটনার সূত্রে সংযুক্ত করেন *আফটারলাইভস* উপন্যাসে। যেহেতু এ উপন্যাসে জীবন এবং ইতিহাসকে প্রখর সচেতনতায় লেখক সমান্তরালভাবে উপস্থাপন করেন, সেহেতু সময়কাল ও প্রেক্ষাপটের বিষয়ে তিনি স্বভাবতই খুব স্বচ্ছ।

খলিফা ও বিআশার বিয়ের বছরে অর্থাৎ, ১৯০৭ সালে আফ্রিকার প্রথম উপনিবেশবিরোধী আন্দোলন মাজি-মাজি বিপ্লবের অন্তিম পর্ব চলছিল। মাজি-মাজি বিপ্লব হলো পূর্ব-আফ্রিকার প্রথম বিপ্লব – জার্মান-কলোনির বিরুদ্ধে আফ্রিকার সাধারণ মানুষের গেরিলা যুদ্ধ। জার্মান তুলার খামারে নির্মম শ্রমিক-নিপীড়নকে কেন্দ্র করে ১৯০৫ সালে এ বিপ্লব শুরু হয়ে তিন বছর স্থায়ী হয় (Russell, 2018: 91)। পদানত জাতির বিদ্রোহ জার্মানদের অধিকতর বর্বর ও আগ্রাসী করে তোলে। তারা গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়, শস্যক্ষেত দলিত করে, লুণ্ঠন করে খাদ্যগুদাম। বিপ্লবীদের ঝলসানো শরীরগুলো ঝুলিয়ে দেয় রাস্তার পাশে ফাঁসিকাষ্ঠে। বিপ্লবের পর জার্মানরা স্থির হয়ে বসলে আমুর বিয়াশ্রার মৃত্যু হয়। এভাবে খলিফার বাবা-মায়ের বিবাহ থেকে শুরু করে ১৯০৭ সালে খলিফার বিয়ে পর্যন্ত প্রায় অর্ধ-শতাব্দী সময়কে অসাধারণ সংশক্তিতে লেখক প্রথম পরিচ্ছেদের ছোট্ট পরিসরে রূপান্বিত করেন।

গুরনাহ *আফটারলাইভসে* প্রধান চরিত্রগুলোর সূত্রে কয়েকটি উপ-উপাখ্যান তৈরি করেন এবং মূল আখ্যানের সাথে সে সাব-প্লটগুলোকে সংশ্লিষ্ট করেন। প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ শুরু হয় অভিন্ন স্থানিক পটে, তানজানিকা শহরে ইলিয়াসের আগমনের মধ্য দিয়ে। জার্মান-প্রভুর সুপারিশে সিসাল এস্টেটে চাকরির সূত্রে ইলিয়াসের সাথে খলিফার সখ্য তৈরি হয়। তাদের বন্ধুত্ব ও আলাপচারিতাসূত্রে লেখক ইলিয়াসের অতীত-বর্তমানকে সূত্রাবদ্ধ করেন। সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণকে শিথিল করে সংলাপ-পরম্পরার মধ্য দিয়ে চরিত্রের অতীত উন্মোচন ও চরিত্রটিকে বর্তমান প্রেক্ষাপটে অন্তঃপ্রবিষ্ট করা গুরনাহর উপন্যাসের একটি পরোক্ষ কৌশল। ইলিয়াস খলিফাকে জানায় যে, দশ বছর আগে কীভাবে দারিদ্র্যের তাড়নায় মাত্র এগারো বছর বয়সে ঘর থেকে পালিয়ে ট্রেন-স্টেশনে এক স্কুজট্রুপ আসকারির হাতে বন্দি হয়ে পাহাড়ের দিকে চলে যায় সে। সেখান থেকে পালিয়ে এক উদার জার্মান-মালিকের কফি-ফার্মে কাজ নিয়ে মিশন স্কুলে পড়া, গির্জায় প্রার্থনা করা এবং নয় বছরের বিশ্বস্ততার বিনিময়ে প্রভুর সুপারিশে এ সিসাল ব্যাংকে তার চাকরি করার আদ্যোপান্ত উন্মোচিত হয় খলিফা ও ইলিয়াসের নিত্যদিনের কথপোকথনের সূত্রে। খলিফার পরামর্শে ইলিয়াস দশ বছর পর তার গ্রামের বাড়িতে ফিরে গিয়ে জানতে পারে যে, বাবা-মায়ের মৃত্যুর পর তার একমাত্র ছোটবোন আফিয়া অন্যত্র একটি পরিবারে আশ্রিতা এবং তাদের নিগ্রহের শিকার। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেই ভিন্নভাবে লেখক তৈরি করেন আফিয়ার আখ্যান। ইলিয়াস দশ বছর বয়সী আফিয়াকে নিয়ে ফিরে আসে তার কর্মস্থানসংলগ্ন বাসায়।

ইলিয়াস মাঝে-মাঝে খলিফার বাড়িতে সন্ধ্যার আড্ডায় শামিল হয়। সেখানে সম্প্রতি রাজনৈতিক ঘটনাবলির প্রসঙ্গ উঠে আসে। জার্মানির সাথে ব্রিটেনের দ্বন্দ্বে আসন্ন বড়যুদ্ধের রটনা সম্পর্কে কথা বলে তারা। জার্মান-প্রভুর আশীর্বাদপ্রাপ্ত ইলিয়াস স্বভাবতই জার্মানদের পক্ষে সাফাই গায়। কিন্তু মাঙ্গুঙ্গ তাকে পরিহাস করে বলে – 'বন্ধু, তারা

(জার্মানরা) তোমার মাথা খেয়েছে'। ইলিয়াস ওই আসরেই ঘোষণা দেয় যে, সে জার্মান স্কুজট্রুপারে ভলান্টিয়ার হিসেবে যোগ দেবে। খলিফা চিৎকার করে বলে – 'তুমি কি পাগল?... এটা দুই হিংস্র ও নোংরা আক্রমণকারীদের মধ্যকার বিষয়। একটা আমাদের এদিকের এবং অন্যটা উত্তরের। কে আমাদের সম্পূর্ণ গিলে খাবে, তাই নিয়ে লড়াই করছে তারা। এর মধ্যে তোমার কী করার আছে? (AbdulRazak, 2021: 42) তা সত্ত্বেও ইলিয়াস জার্মানির পক্ষে যুদ্ধে যেতে বদ্ধপরিকর হয়। আফিয়ার একটি বছরের সুখ রাহুগ্রস্ত হয়। তাকে ফিরে যেতে হয় তার পূর্বের ঠিকানায় এবং হতে হয় অধিকতর নিগৃহীত। বিপন্ন আফিয়ার একটি ছোট্ট চিরকুট পেয়ে খলিফা তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায়। বাবা খলিফা এবং মা বিয়াশার সাথে নিরাপদে তার দিন কাটতে থাকে।

আফটারলাইভসের দ্বিতীয় অধ্যায়ের স্থান-কাল প্রতিবেশ ভিন্ন। এ অধ্যায়ের প্রধান চরিত্র হামজা। *প্যারাডাইস* উপন্যাসে স্কুজট্রুপার আসকারি দলের সাথে মিশে যাওয়া পলাতক ইউসুফ চরিত্রের সাথে ধারাবাহিকতা কল্পনা করা যায় এ হামজা চরিত্রের মধ্যে। কিন্তু সে ধারাবাহিকতার সূত্রগুলো লেখক প্রকাশ করেন ধীরে-ধীরে। প্রাচীন যুগের মহান গল্পকথকদের মতো বিশাল আখ্যানকে তিনি গেঁথে তোলেন গভীর প্রজ্ঞা ও ধী সহকারে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরুতে আমরা হামজা চরিত্রকে পাই জার্মান স্কুজট্রুপারে একজন আসকারি সৈন্য হিসেবে, যে স্বেচ্ছায় ভলান্টিয়ার হিসেবে যোগ দেয়। এ উপন্যাসে হামজা চরিত্রটি আফ্রিকার ইতিহাসে আসকারি সৈন্যদের প্রতি জার্মান অফিসারদের বর্বরতম অত্যাচারের একটি প্রতীকী দলিল। জার্মান অফিসারের কাছে হামজা বয়স বাড়িয়ে বলে। প্রকৃতপক্ষে তার বয়স ছিল সতেরো। *প্যারাডাইস* উপন্যাসের শেষাংশে ইউসুফের বয়স ছিল প্রায় সতেরো। ফলে, আসকারি সৈন্যদের সাথে ভিড়ে যাওয়া সুদর্শন তরুণ হামজা হতে পারে ইউসুফ চরিত্রের রূপান্তরিত সত্তা। অত্যাচারী অফিসার ফেল্ডওয়েবেলের তুলনায় উচ্চপদস্থ অপর জার্মান অফিসার ওবারলিউটনেন্ট ছিল দয়ালু। ব্যারাকে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যাওয়া তার ছোট ভাইয়ের স্মৃতি মনে করে ওবারলিউটনেন্ট হামজাকে সৈন্যদল থেকে তুলে নেয় তার ব্যক্তিগত পরিচারক হিসেবে এবং মনপ্রাণ দিয়ে হামজাকে জার্মান ভাষা শেখতে থাকে, যেন সে তার মৃত ভাইয়ের মতো একদিন শিলারের কবিতা পড়তে সক্ষম হয়। সমকামিতার উদ্দেশ্য তার ছিল না, এ কথা পরবর্তীকালে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু, *প্যারাডাইসের* ইউসুফের মতোই হামজা সুদর্শন ও তরুণ হওয়ায় এবং জার্মান শিবিরে সমকামিতার দৃষ্টান্ত থাকায় অন্য সৈনিকেরা ওবারলিউটেন্ট ও তাকে নিয়ে মস্করা করে – "তুমি একটা 'সোগা',... সেজন্যই সে তোমাকে বেছে নিয়েছে। সে চায় মিষ্টি সুন্দর কাউকে, যে তার পশ্চাদ্দেশ মালিশ করে দেবে আর ডিনার সার্ভ করবে। ওই যে পাহাড়ের দিকে শীত নামছে, রাতে তাকে উষ্ণ রাখার জন্য কাউকে প্রয়োজন, ছোট্ট বউয়ের মতো কাউকে। কী করছ তুমি এখানে? যে কেউ বুঝবে যে সৈন্য হওয়ার ক্ষেত্রে তুমি বেশি সুন্দর।" (AbdulRazak, 2021: 65) আব্দুলরাজাক গুরনাহর বিভিন্ন

উপন্যাসে সমকামিতার নানা দৃষ্টান্ত আছে। *আফটারলাইভসে* তিনি জার্মান অফিসার এবং সৈন্যদের সমকামিতার প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাননি। কাফেলা-সর্দার মোহাম্মদ আবদাল্লাহর সূত্রে *প্যারাডাইস* উপন্যাসেও সমকামিতার প্রসঙ্গ আসে।

ইতোমধ্যে জার্মান-শিবিরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বারতা আসে। পূর্ব আফ্রিকা তখন ব্রিটিশ, ডাচ, পর্তুগিজ, বেলজিয়াম প্রভৃতি ইউরোপীয়দের কব্জায়। ব্রিটিশ নেভি সাজোয়া বহর নিয়ে জার্মান হাসপাতাল ও শহরের দিকে লক্ষ করে আক্রমণ চালায়। শহর ধ্বংস হয়ে মারা যায় আফ্রিকার অসংখ্য নিরীহ মানুষ। মসি থেকে উলুগুরু পার হয়ে জার্মান-ট্রুপ রুফিজি নদীর দিকে চলতে থাকে। রুফিজি নদীতে ভয়াবহ বন্যা ও মশার অত্যাচারে কালাপানি জ্বরে ভুগে, ডায়রিয়ায়, আমাশয়ে বহু সৈন্য মারা যায়। বাহক সৈন্যদের কেউ-কেউ যায় কুমিরের পেটে। মাহিওয়ার যুদ্ধে প্রাণ যায় বহু সৈন্যের। অসংখ্য আফ্রিকান না খেতে পেয়ে মারা যায়। গুরনাহ একটি মাত্র স্কুজট্রুপের যুদ্ধ-বাস্তবতার মধ্য দিয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের এ অংশের সমগ্রতাকে প্রতীকায়িত করেন। গুরনাহ তাঁর সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ থেকে এ যুদ্ধের ভয়াবহতা ও তার পরিণতি বয়ান করেন এবং কীভাবে আফ্রিকার মানুষকে ব্যবহার করে জার্মান এবং ব্রিটিশ উভয় পক্ষ গা-বাঁচিয়ে পরস্পর ভাতৃঘাতী যুদ্ধে অবতীর্ণ করে তাদেরই রক্তে রঞ্জিত করে তাদের পুণ্যভূমি সেই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে লেখক জলজ্যান্ত করে তোলেন তাঁর উপন্যাসে। ১৯১৬ সালে ব্রিটিশ-বাহিনী টাঙ্গায় প্রবেশ করে। যুদ্ধের দুটি বছর কেটে যায়। ইলিয়াসের সন্ধান মেলে না। আফিয়া পঞ্চদশী হয়। বেতন বন্ধ হওয়া, ট্রেনিংয়ের অত্যাচার, খাবারের অভাব, মরুভূমিতে নগ্ন পায়ে একটানা যুদ্ধ এবং ফেল্ডওয়েবলের নির্দেশে সমস্ত মালপত্র আসকারিদের উপর চাপিয়ে দেয়ায় প্রচণ্ড ক্ষোভ ও বিদ্রোহ জমে জার্মান-আসকারিদের মনে। এক রাতে উনত্রিশ জন আসকারি বিদ্রোহী পালিয়ে যায় শিবির থেকে। তাদের অনুসরণ করে আরো বারো জন। প্রচণ্ড ক্ষোভে ফেটে পড়া ফেল্ডওয়েবলের সন্দেহের তীর বিদ্ধ হয় হামজার প্রতি। বিশ্বাসঘাতক সাব্যস্ত করে তাকে ঘুরানো তরবারির মতো বন্য চাবুকে ক্ষতবিক্ষত করে ফেল্ডওয়েবেল। অর্ধমৃত অবস্থায় ওবারলিউটনেন্ট দুইজন আসকারিকে সাথে নিয়ে স্ট্রেচারে করে তাকে নিয়ে যায় জার্মান মিশনারিতে। প্যাস্টরের ডাক্তারিবিদ্যা এবং তার সহযোগী প্যসকলের দুই বছরের শুশ্রূষায় ক্রমে-ক্রমে সুস্থ হয়ে ওঠে হামজা। মিশনারি থেকে ফেরার সময় ওবারলিউটনেন্টের রেখে যাওয়া শিলারের বইটি হামজা সাথে করে নিয়ে আসে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির সাথে-সাথে *আফটারলাইভস* উপন্যাসের দ্বিতীয় অধ্যায় শেষ হয়।

তৃতীয় অধ্যায়ে চব্বিশ বছরের যুদ্ধফেরত যুবক হামজা চলে আসে তানজানিকার সেই স্থানে, যেখান থেকে সে একদিন পালিয়ে গিয়ে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। এ সূত্রে গুরনাহ প্রথম অধ্যায়ের সাথে তৃতীয় অধ্যায়ের স্থানিক ঐক্য তৈরি করেন। এমনকি *প্যারাডাইস* উপন্যাসের সাথে *আফটারলাইভস* উপন্যাসের স্থান ও চরিত্রসমূহের একটি পরম্পরা সৃষ্টি করেন। কপর্দকশূন্য, নিরাশ্রয় হামজা তার পূর্বের আস্তানায় গিয়ে দেখে তার প্রভু

আরব-বণিকের ছোট্ট বাড়ি, বাড়ির সামনের সুন্দর বাগান, দোকান – কিছুই আর আগের মতো নেই। সেখানে আমুর বিয়াশ্রার পুত্র নাসোর বিয়াশ্রা তার মালগুদামে হামজাকে নতুন কাজ দেয়। শুরুতে খলিফার সাথে হামজার সম্পর্ক খারাপ হলেও নিরন্ন, নিরাশ্রয় হামজাকে দেখে দয়ার্দ্র হয়ে সে তার বাড়ির দেউড়ি-ঘরে তাকে অস্থায়ীভাবে থাকার ব্যবস্থা এবং নিজ বাড়িতে খাবার ব্যবস্থা করে দেয়। এ যাতায়াতসূত্রে আফিয়ার সাথে হামজার হৃদয়-ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়। রমজান মাসের সন্ধ্যায় দুজন নর-নারী পরস্পর সহমর্মিতায়-ভালোবাসায় একাত্ম হয়ে পরস্পরকে বলে চলে তাদের জীবনের একান্ত গোপন কথাগুলো। তাদের সংলাপসূত্রে লেখক হামজা ও আফিয়া চরিত্রের পূর্বাপরকে সূত্রাবদ্ধ করেন এবং চরিত্রদুটির বিবর্তনকে স্পষ্ট করে তোলেন। তাদের গোপন প্রণয় অজানা থাকে না খলিফা ও বিআশার কাছে। খলিফা ইলিয়াসের অনুপস্থিতিতে এতদিন আফিয়াকে প্রতিপালন করেছে। ফলে, তার সম্পর্কে বিশেষ দায়িত্ববোধ থেকেই রহস্যময় হামজার কাছে তার পূর্বাপর জানতে চায়। হামজার অতীত বর্ণনার সূত্রেই লেখক হামজা চরিত্রটিকে একটি ধারাবাহিক পারম্পর্যে বর্তমান-সংলগ্ন করেন। হামজার বর্ণনায় তার যে অতীত জানা যায়, তা *প্যারাডাইস* উপন্যাসের ইউসুফের জীবনের ঘটনাবলির সাথে অবিকল ও অনন্যদর্শী। হামজা বলে –

> আমার বাবা তার ঋণ শোধ করতে আমাকে এক বণিকের কাছে দিয়ে দেয়।... সেই বণিক এই শহরেই বাস করত এবং আমাকে তার দোকানে কাজ করার জন্য নিয়ে আসে, যদিও সে দোকানদার ছিল না। দোকানটি ছিল তার ব্যবসার ছোট্ট একটি অংশ, আসল ছিল কাফেলা-ব্যবসা।... সে আমাকে একটা বাণিজ্যযাত্রায় নিয়ে গিয়েছিল গহিন অঞ্চলে, কয়েক মাস দীর্ঘ ছিল সেই যাত্রা। অসাধারণ ছিল। আমরা হ্রদের সমস্ত রাস্তায়, অন্যধারের পাহাড়-পর্বত ছাড়িয়ে গিয়েছিলাম। (AbdulRazak, 2021: 205)

হামজার এ অতীত এবং *প্যারাডাইস* উপন্যাসের ইউসুফের কৈশোর, তার আরব-বণিকপ্রভু এবং হ্রদ-পাহাড়ময় বিচিত্র স্বর্গে-কাফেলা-যাত্রার অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতাময় জীবন একাবয়ব এবং সমন্বিত। কিন্তু হামজার বয়ানে তার বণিক-প্রভুর নাম হাশিম আবুবকর আর ইউসুফের প্রভুর নাম ছিল সৈয়দ আজিজ। হামজা খলিফার কাছে বলে যে, হাশিম চাচা তাকে সম্পত্তির মতো মনে করত এবং দাসত্ব ভালো লাগেনি বলে সে পালিয়ে যুদ্ধে চলে যায়। *প্যারাডাইস* উপন্যাসের ইউসুফ চরিত্রও অনুরূপ বাস্তবতার সাক্ষী। এ উপন্যাসে ইউসুফের জার্মান আসকারি দলের সাথে মিশে যাওয়া মূলত *আফটারলাইভস* উপন্যাসের হামজা চরিত্রেরই সন্ধিস্থল যা এই দুটি উপন্যাসকে চরিত্রসূত্রে একটি দীর্ঘ পরম্পরায় অনবচ্ছেদ্য করে তোলে।

আফটারলাইভসে যুদ্ধ থেকে ফিরে হামজা প্রথমে যায় তার জন্মভূমিতে। সেখানে তার বাবা-মা বা পরিবারের কাউকে খুঁজে না পেয়ে চলে আসে তানজানিয়ায়, ফেলে-যাওয়া হাশিম-চাচার বাড়িতে তার বন্ধু ফরিদির খোঁজে। মূলত *প্যারাডাইস* উপন্যাসে ইউসুফের

বন্ধু খলিলের ছায়ায় রচিত হামজা-বর্ণিত এই ফরিদি চরিত্রটি। হামজা খলিফাকে বলে –

> আমি একজন বন্ধু বানিয়েছিলাম, প্রথম যখন এখানে ছিলাম। আমি আমার পেছনের বছরগুলোর দিকে তাকাই, আমি ভাবি যে, আমার জীবনে সে একমাত্র বন্ধু ছিল এবং যখন আমি শূন্য ও বহু কারণে কাতর, তখন ফিরে যাওয়ার টান অনুভব করেছিলাম। সেও বণিকের কাছে বন্দি ছিল কিন্তু যখন আমি ফিরে আসলাম, দোকানটা ছিল না এবং তাকে খুঁজে পাইনি আমি। আমি হাশিম চাচার কথা মানুষের কাছে জিজ্ঞসা করতে সাহস পাইনি, যদি আমার বাবার ঋণ আমার উপর বর্তায়। (AbdulRazak, 2021: 206)

স্থানীয় লোক হওয়ায় খলিফা হাশিম আবুবকর ও পলাতক ফরিদির খবর দিতে পারে হামজাকে। সে জানায় যে, যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে ফরিদি বণিক হাশিমের জমানো টাকা ও তার দ্বিতীয় স্ত্রী নিয়ে পালিয়ে যায়। হাশিম চাচাও তার সম্পত্তি বিক্রি করে মোগাদিসু অথবা এডেন বা অন্য কোথাও চলে যায়। হামজা খলিফাকে জানায় যে, যখন সে এ অঞ্চলে প্রথম আসে তখন ফরিদি তাকে ভাইয়ের মতো আগলে রাখত। কেউ কাউকে তেমন জানত না তারা, কেবল একই দোকানে কাজ করত। মাঝে-মাঝে তারা শহরে বেড়াতে যেত। হামজা খলিফাকে জানায়, যে তরুণী স্ত্রীর সঙ্গে ফরিদি পালিয়ে যায়, সে তার ছোট বোন এবং তার এ বোনটির জীবনও বন্ধক ছিল হাশিম চাচার কাছে। হামজার এসব বর্ণনা থেকে স্পষ্ট যে, *প্যারাডাইসের* খলিলই *আফটারলাইভসের* ফরিদি; পূর্ববর্তী উপন্যাসের আমিনা পরবর্তী উপন্যাসে হাশিম চাচার দ্বিতীয় স্ত্রী এবং হামজা আর কেউ নয়, *প্যারাডাইস* উপন্যাসের বয়ঃপ্রাপ্ত ইউসুফ। এ ধারণা আরো জোরালো হয় যখন হামজা হাশিম চাচার বাড়ির সামনের বাগানটির কথা জানতে চায় খলিফার কাছে। আমরা জানি, *প্যারাডাইসের* ইউসুফের কাছে আজিজ চাচার বাড়ির সামনে প্রাচীরে ঘেরা উদ্যানটি ছিল দ্বিতীয় স্বর্গের মতো। খলিফা জানায় যে, হাশিম চাচা প্রস্থানের পর সেই বাড়িটি ব্রিটিশদের সাথে আসা একজন ভারতীয় কিনে নেয় এবং বাগানটিকে গুঁড়িয়ে সেখানে নতুন ম্যানশন বা অট্টালিকা তৈরি করে। খলিফা আরো জানায়, এ ভারতীয়রাই পূর্ব-আফ্রিকার সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য দখল করে আছে। সুতরাং, *আফটারলাইভসের* হামজার জীবনের প্রায় সবগুলো পূর্বসূত্রই *প্যারাডাইসের* ইউসুফের যাপিত জীবনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। উপন্যাসের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য লেখক সঙ্গত কারণেই কেবল চরিত্রগুলোর নাম পরিবর্তন করেছেন কিন্তু ঘটনার আনুপূর্বিক ঐক্য বজায় রেখেছেন।

আফটারলাইভসের চতুর্থ অধ্যায় মূলত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী বাস্তবতায় হামজার উত্তর-প্রজন্মের আলেখ্য। ইলিয়াসকে কেন্দ্র করে লেখক দ্বিতীয় প্রজন্মের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শোষণ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বাস্তবতায় আফ্রিকার মানুষের নিষ্করুণ জীবনকে রূপান্বিত করতে চেয়েছেন। হামজা ও আফিয়ার বিয়ের বছরখানেক পর চৌদ্দতম পরিচ্ছেদে আফিয়া যে পুত্রসন্তান প্রসব করে, তার নাম রাখা হয় তার হারিয়ে যাওয়া ভাই ইলিয়াসের নামে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার পূর্ব-আফ্রিকায় কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই তাদের

নব্যউপনিবেশ কায়েম করে। ঔপনিবেশিক স্বার্থে তারা জনগণের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নয়নের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। ব্রিটিশ সরকার স্কুল-হাসপাতাল তৈরি করে, অথচ দেশের কর্মীরা বেকার পড়ে রয়, গ্রামের মানুষ ক্ষুধার্ত থাকে। নাসোর বিয়াশ্রা কর্মচারীদের বেতন দিতে পারে না এবং বাধ্য হয়ে চোরাকারবারিতে জড়িয়ে পড়ে। এ অর্থনৈতিক অভিঘাতের সুফল হিসেবে ছোট ইলিয়াস ভর্তি হয় স্কুলে আর আফিয়া কাজ পায় নতুন মাতৃসদনে। ওদিকে জার্মান স্কুজট্রুপের আসকারিদের জন্য পেনশনের ঘোষণা দেয় জার্মান সরকার। পেনশন তুলতে নৈতিকভাবে দ্বিধাগ্রস্ত হয় হামজা।

উপন্যাসের আখ্যান ক্রমে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে গড়ায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি কালে ১৯৪২ সালে ৬৮ বছর বয়সে খলিফার মৃত্যু হয়। ১৯৪২এ ইতালি সম্পূর্ণরূপে আবিসিনিয়া দখল করে নেয়। সে বছর ছোট ইলিয়াসের বয়স উনিশ। হামজার নিষেধ সত্ত্বেও ইলিয়াস ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রেজিমেন্টে (KAR -- Kings African Rifles) যোগদান করে। সে কেনিয়ার গিলগিলে চলে যায় ট্রেনিং নিতে এবং দার-এস-সালামে কোস্টাল গার্ডের সাথে টহলের কাজে নিযুক্ত হয়। কেবল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নয় বরং বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী দৈশিক ও বৈশ্বিক বাস্তবতায় নব্যউপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় প্রজন্মের উপনিবেশবিরোধী স্বাধীনতা-আন্দোলনকেও উপন্যাসের কাহিনিতে বিমিলিত করেন লেখক। যুদ্ধফেরত ইলিয়াস যে বছর শহরের একটি স্কুলে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করে, সে বছরই ঘানার জনপ্রিয় নেতা কোয়ামে নক্রুমাহ্ (১৯০৯-১৯৭২) আফ্রিকায় উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনের ডাক দেন এবং সাম্রাজ্যবাদকে ঔপনিবেশিকতার শেষ ধাপরূপে চিহ্নিত করেন (Kwame, 1966 : x)। ঔপন্যাসিক একটি ইঙ্গিত দেন যে, ওই সময়ে ইলিয়াস নতুন উপনিবেশবিরোধী এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ না করলেও পরবর্তীকালে সে তাতে সক্রিয় হবে। কিন্তু যে ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সে নব্য উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় হবে, তার প্রেক্ষাপট কেবল এ উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত; পরিণতি দৃশ্যমান নয়। ১৯৫০ সালে ইলিয়াস ব্রিটিশ সম্প্রচার কেন্দ্রে যোগ দেয়। ঔপনিবেশিক ছত্রছায়ায় রেডিওতে ও পত্র-পত্রিকায় তার লেখা প্রচারিত হয়। হামজার বয়স তখন পঞ্চাশ। নাসোর বিয়াশ্রা নানা দিকে তার ব্যবসা বিস্তৃত করে। ১৯৫০ সালে জুলিয়াস নায়েরের নেতৃত্বে তানুর (T.A.N.U) মার্চের মধ্য দিয়ে আফ্রিকার বিভিন্ন অংশে ঔপনিবেশিকতা-মোচনের (decolonisation) আন্দোলন শুরু হয়। ব্রিটিশ সরকারের নিয়ন্ত্রণেই ১৯৬০ সালে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে তানু ৯৮ শতাংশ ভোট নিয়ে সরকার গঠন করে। ১৯৬৩ সালে ব্রিটিশ সরকার আফ্রিকা থেকে চলে যায় (AbdulRazak, 2021: 267)। গুরনাহ তাঁর *আফটারলাইভসে* বৈশ্বিকতাকে দৈশিকতার সাথে এমনভাবে মিলিয়েছেন যে একবার মনে হয়, জার্মান ও ইংল্যান্ডের ঔপনিবেশিক দ্বন্দ্বের ফলস্বরূপ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও নব্য উপনিবেশবাদী তৎপরতার চিত্রই এ উপন্যাসে প্রধান; আবার কখনো মনে হয়, আফ্রিকায় হামজা-আফিয়ার মতো মানুষের

নিষ্করুণ-শোষিত জীবনই লেখকের প্রধান আগ্রহের বিষয়। প্রকৃতপক্ষে, *আফটারলাইভস* উপন্যাসে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট যেন আধার এবং চরিত্রগুলোর জীবন যেন আধেয়। উপন্যাসে এ আধার ও আধেয়র বিন্যাস কখনো সমান্তরাল, কখনো পরস্পর অন্তঃপ্রবিষ্ট। চলমান ইতিহাসের সাথে জীবনের প্রবহমানতা উপন্যাসকে দ্বিমাত্রিক অথচ অন্তর্বাহী করে তোলে।

গুরনাহ তাঁর *আফটারলাইভস* উপন্যাসে বিশ্ব-রাজনীতির সাথে আফ্রিকার আঞ্চলিক রাজনীতিকে যেভাবে সম্পর্কিত করেছেন তা বিস্ময়কর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে জার্মানি আদর্শগতভাবে বিভক্ত হয়ে যায়। ফেডারেল রিপাবলিক অফ জার্মানি বা পশ্চিম জার্মানি ছিল আমেরিকা-ইংল্যান্ড-ফ্রান্স অধিকৃত অংশ। অপরদিকে পূর্ব-জার্মানি অর্থাৎ জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক (GDR) ছিল সভিয়েত ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রিত। ফলে পূর্ব-জার্মানির জনগণ ঔপনিবেশিক রাজনীতি নিয়ে সচেতন ও সোচ্চার ছিল। গরিব দেশগুলোর সমর্থনের আশায় জি.ডি.আরের দেয়া স্কলারশিপ নিয়েই স্বাধীনতার দুই বছর পর ১৯৬৩ সালে ইলিয়াস ৩৮ বছর বয়সে জার্মানিতে চলে যায়। সেখানে জার্মানভাষা-শিক্ষার পাশাপাশি সে জার্মান সম্প্রচার কেন্দ্রে যোগ দেয়। সেই সূত্রে সে তার নিখোঁজ মামা ইলিয়াসকে খুঁজতে তৎপর হয়। তার সূত্রেই জানা যায় ১৯৫৪ সালে জার্মানিতে ব্রিটিশ বোমা-হামলায় শহরের একাংশের প্রায় ৯০ শতাংশ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ইতিহাস। সেখানে গুঁড়িয়ে যায় প্যাস্টর এবং ফারু প্যাস্টরের শহরের চার্চটিও। স্বামী-স্ত্রী এবং তাদের ছোট মেয়েটি মিলিয়ে যায় সেই ধ্বংসস্তূপে। ছোট ইলিয়াসের সূত্রে জানা যায় তার মামা একটি নাৎসী সংগঠনে নব্য উপনিবেশবাদীদের সাথে যোগ দেয়। কারণ নাৎসি শক্তি পুনরায় তাদের উপনিবেশ ফিরে পাবার পাঁয়তারা করছিল এবং ইলিয়াস আফ্রিকান হয়েও তাদেরই সমর্থক ও সহচর ছিল। চরিত্রের পূর্বাপর এবং তার সম্পূর্ণ বিবর্তনকে স্পষ্ট করে তোলা গুরনাহর কাছে যেন এক শৈল্পিক নৈতিকতা। শুধু খলিফা, আফিয়া, হামজার ক্ষেত্রে নয়, ওবারলিউটেন্ট, ফারু প্যাস্টর, বড় ইলিয়াস প্রত্যেকটি চরিত্রের বৃত্তায়নের ক্ষেত্রে গুরনাহ অত্যন্ত দায়িত্বশীল। ছোট ইলিয়াসের জার্মানি-যাত্রা এবং নানা অনুসন্ধান মূলত হারিয়ে-যাওয়া ইলিয়াস চরিত্রটিকে পূর্ণতা দেয়া এবং উপন্যাসকে আদি-মধ্য-অন্ত সমন্বিত করার একটি প্রয়াস এবং সে সূত্রে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে ইংল্যান্ড ও জার্মানি পরাশক্তিদ্বয়ের লড়াই ও আফ্রিকাকে পুনরায় উপনিবেশিত করার ষড়যন্ত্র এবং এ সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র রুখে দিতে সভিয়েত রাশিয়ার তৎপরতায় পূর্ব-আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটকে চিহ্নিত করাও গুরনাহর সচেতন অভিপ্রায় ছিল। ফলে, লেখক ঘটনা ও চরিত্রসূত্রে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর দৈশিক ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটের বহুমুখী সংকটের একটি ছোট্ট ছক আঁকেন তাঁর উপন্যাসে। এ বিষয়ে উত্তর প্রজন্মের ইলিয়াস মাধ্যম হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

নানা আর্কাইভ ঘেঁটে ইলিয়াস জানতে পারে যে, তার মামা ১৯১৭ সালে মাহিওয়ার যুদ্ধে আহত হয়ে, লিন্ডি এবং মোম্বাসাতে কিছু দিন বন্দি থেকে যুদ্ধের পর জার্মানিতে চলে যায়। ১৯৩৪ সালে সে চ্যাম্পিয়ন মেডেলের জন্য আবেদন করে ব্যর্থ হয়। ১৯৩৮ সালে ইলিয়াসের মামা বার্লিনে থাকা অবস্থায় এক জার্মান নারীর প্রেমে পড়েন এবং ১৯৩৫ সালে জার্মানির নতুন আইনে নাৎসি জাতির আইন-ভঙ্গের অপরাধে তাকে বার্লিনের বাইরে একটি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে কয়েদ করে রাখা হয়। তার একমাত্র পুত্র পল ১৯৪২ সালে স্বেচ্ছায় তার বাবাকে খুঁজতে ক্যাম্পে যায় এবং সেখান থেকে পালাতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। ইলিয়াসও ১৯৪২ সালে কারাভ্যন্তরে মৃত্যুবরণ করে। এভাবে জার্মান-ভক্ত ইলিয়াস চরিত্রটি একটি আয়রনিক পরিণতির মধ্য দিয়ে পূর্ণতা পায়। চরিত্রটি আমাদের কাঁদায় না, হাসায় না; কেবল বিস্মিত করে। ইতিহাসের প্রতি দায়বদ্ধ থেকেও এমন বাস্তবসম্মত চরিত্র সৃষ্টি করা সহজ নয়। আফ্রিকার অন্যান্য লেখকের সাথে গুরনাহর পার্থক্য এ নিরপেক্ষ স্বভাবে। কেবল শোষণ-শাসনের একতরফা অভিঘাত চিত্রণ নয়, না-জানা অনেক রূঢ় সত্যকে প্রতিভাত করে একটি সামগ্রিক বাস্তবতার চিত্রণে যে মহৎ শিল্পদর্শিতা প্রয়োজন, তা গুরনাহর ছিল। খলিফা-হামজা এবং ইলিয়াসকে ঘিরে দুটি প্রজন্মের ঔপনিবেশিক বাস্তবতা ও স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসকে তিনি একটি সংহত আখ্যানে সংবদ্ধ করেন। ঘটনা ও চরিত্রের প্রয়োজনে তিনি ইতিহাসের গতির লাগাম টেনে ধরেন কখনো। যেমন, ১৯৬৪ সালে আফ্রিকার স্বাধীনতাকামী বিপ্লববাদী জনতার হাতে বহু ইংরেজ-আরব-ভারতীয়-ইউরোপীয় নির্মমভাবে নিহত হয় জানজিবার বিপ্লবের সময়। লেখক এ উপন্যাসে সে প্রেক্ষাপটের ইঙ্গিত দিয়েছেন, কিন্তু তার ভয়াবহতাকে স্পর্শ করেননি। এখানে আমুর বিয়াশ্রা তাঁর ব্যবসাকে উৎকর্ষের শিখরে নিয়ে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করে। *প্যারাডাইসে* সৈয়দ সাহেব তানজানিয়া থেকে চলে যাবার পরে আর ফিরে আসার খবর জানা যায় না। ফলে, উপনিবেশ-পরবর্তী আফ্রিকার বিপ্লবী উত্থান ও সহিংসতাকে সামান্য স্পর্শ করে গেলেও লেখক তার পরিণতি চিত্রণ করেননি। অথচ সেই সহিংস প্রেক্ষাপটেই গুরনাহ আফ্রিকা ছেড়ে ইংল্যান্ডে প্রবাসী হতে বাধ্য হন। হয়তো অন্য কোনো উপন্যাসে লেখক একদিন সেই বাস্তবতাকে রূপায়ণ করবেন।

প্যারাডাইস ও *আফটারলাইভস* মিলে প্রায় শতাব্দীকালের ইতিহাসকে আবদুলরাজাক ফ্রেমবন্দি করেছেন বস্তুনিষ্ঠা এবং কল্পনা-ক্ষমতার অসীম শক্তিতে। ইতিহাসের গভীরে ঢুকে, আর্কাইভ থেকে মুছে যাওয়া ইতিহাসকে পুনরুদ্ধার করে তাকে অবিনশ্বর করে তুলেছেন তাঁর উপন্যাসে। *আফটারলাইভস* ও *প্যারাডাইস* পৃথকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও নানা সূত্রে পরস্পর-সম্পর্কিত। দুটি উপন্যাসের সময়কাল ও প্রেক্ষাপটের ধারাবাহিকতায় কোনো জলবিভাজনরেখা অনুভব করা যায় না। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের ধারাবাহিক রূপায়ণে তাই উপন্যাস দুটি পরস্পর-সাপেক্ষ ও গভীরভাবে ঐকতানিক।

৩.

গুরনাহ 'ন্যারেটিভ' ধরনে উপন্যাস রচনা করেন কিন্তু আখ্যানবিন্যাসের সূত্রে তাঁর উপন্যাস প্রতীকময় হয়ে ওঠে। বিস্তৃত সময়পটকে তিনি একটি মাত্র আখ্যান ও কয়েকটি চরিত্রপাত্রে এমনভাবে উপস্থাপন করেন যে তা সমগ্র আফ্রিকার একটি দর্পণ হয়ে ওঠে। যেমন, পূর্ব-আফ্রিকায় আরব-বণিকদের কাফেলা-বাণিজ্যের একশ বছর বা তারও বেশি সময়ের ইতিহাসকে তিনি *প্যারাডাইস* উপন্যাসের একটি মাত্র কাফেলা-দলের মাধ্যমে চিত্রিত করেন। কিংবা দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধ এবং আফ্রিকার মানুষের জীবনে ঔপনিবেশিক অভিঘাতের প্রায় অখণ্ড বাস্তবতাকে তিনি *আফটারলাইভসের* ছোট্ট একটি শহরের একটি পরিবার ও কয়েকটি চরিত্রের সূত্রে প্রতীকায়িত করেন। চরিত্র এবং আখ্যান দুটিকেই সমান গুরুত্ব দিয়ে, হামজা-কেন্দ্রিক ছোট্ট আসকারি দলকে কেন্দ্র করে তিনি আফ্রিকার অসংখ্য জার্মান-স্কুজট্রুপার দলের একটি মডেল তৈরি করেন। তাঁর *আফটারলাইভস* উপন্যাসে বিশ্বযুদ্ধের অল্প কিছু খণ্ডচিত্রের মাধ্যমে অখণ্ড যুদ্ধবাস্তবতা কষ্টকল্পনীয় নয়। একইভাবে হামজার উত্তর-প্রজন্মের ইলিয়াস চরিত্রের মাধ্যমে ঔপন্যাসিক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও আফ্রিকার স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রেক্ষাপটকে স্পর্শ করেন। এভাবে অসাধারণ সংশ্লেষণ ক্ষমতায় একটি অণু-সংস্করণের মধ্য দিয়ে লেখক আমাদের জানিয়ে দেন যে, হামজার মতো এমন চরিত্র সে সময় একটি নয় অসংখ্য, আফিয়ার মতো অনাথ-আশ্রিতার সংখ্যা অগণিত এবং ইউসুফের মতো ঋণের দায়ে আরবদের দাস আফ্রিকায় তখন সংখ্যাতীত। লেখক আমাদের বুঝিয়ে দেন যে, দুটি উপন্যাস মিলে ইউসুফ এবং হামজার ঘটনা-পরম্পরা সমকালীন আফ্রিকায় এতই স্বাভাবিক, যে চরিত্রের নাম পরিবর্তনে কিছু আসে-যায় না। ইউসুফ হতে পারে হামজা, খলিল হতে পারে ফরিদি কিংবা আমেনা হতে পারে ঋণের দায়ে বন্দি আফ্রিকার যে-কোনো নারীর প্রতীক। আমরা বুঝতে পারি যে বিংশ শতাব্দীতে খলিফার বা আমুর বিয়াশ্রার মতো অসংখ্য গুজরাটি আফ্রিকার যত্রতত্র তাদের ভাগ্যান্বেষণে ব্যস্ত ছিল।

প্যারাডাইস উপন্যাসে বিস্ময়ের সাথে লক্ষণীয় যে, যুগে-যুগে পূর্ব-আফ্রিকার অরণ্য-স্বর্গের শান্তিভঙ্গ করেছে যারা, সেইসব বাণিজ্যলোভী, ক্রীতদাসশিকারি আরব-বণিকদের অত্যাচারের ইতিহাস বিধৃত হয়েছে তাদেরই প্রেক্ষণ থেকে। ইউসুফ চরিত্রের সূত্রে কাফেলা-যাত্রীদের সাথে মিশে, তাদের বাণিজ্যযাত্রার নানা ঘাত-প্রতিঘাতের সাথে একাত্ম হয়েও লেখক অরণ্যবাসীর বঞ্চনার ইতিহাসকে যথাযথভাবেই উপস্থাপন করেন। এই যে অপরের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গোত্রবাসীদের দেখার এক অদ্ভুত আয়রনিক রীতি, তাতে একধরনের সামগ্রিক একাত্মতা এবং প্রকৃত বাস্তবতার মধ্যে লেখকের সহাবস্থান আমাদের মুগ্ধ করে। লেখকের আসক্তি ও নিরাসক্তির মধ্যস্থতায় উপন্যাস হয়ে ওঠে নিরপেক্ষ বাস্তবের ধারক। *আফটারলাইভসেও* আমরা দেখি হামজা চরিত্রের সূত্রে একটি জার্মান স্কুজট্রুপকে অবলম্বন করে গুরনাহ আফ্রিকায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন।

আফ্রিকার যুদ্ধ-বাস্তবতাকে একটি ঔপনিবেশিক দলের অস্তিত্ব-নিরস্তিত্বের ঘটনাবলির মাধ্যমে চিত্রিত করলেও তাতে ইতিহাসের প্রকৃত সত্য ক্ষুণ্ন হয় না। এই বিপরীত ও পরোক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে লেখক প্রকৃত বাস্তবতাকে সপ্রাণ ও নির্বিশেষ করে তোলেন।

ঐতিহাসিক সত্যকে শিল্পিত করার ক্ষেত্রে গুরনাহর বিশ্বস্ততা ও নিরাসক্তি প্রশংসাযোগ্য। স্বজাতির প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা বিস্ময়কর। দৈশিক-বৈশ্বিক, ভৌগোলিক-সামাজিক, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক-সমকালীনতা – সমস্ত দিকে এক অখণ্ড সমগ্রতার বোধ থেকে গুরনাহ তাঁর উপন্যাস রচনা করেন। সত্য, বাস্তব, কল্পনা, কল্পনাতীত, রূঢ়তা ও কারুণ্যের এক অসাধারণ ভারসাম্য রয়েছে তাঁর আখ্যান-পরিকল্পনায় ও চরিত্রচিত্রণে। এ সমুন্নতি ও সমদর্শিতা গুরনাহর সাহিত্যাদর্শের মহৎ গুণ। *প্যারাডাইসে* আফ্রিকার হ্রদ-সমুদ্র-অরণ্য-পাহাড় ও জীবনের স্বর্গীয় সৌন্দর্য ও বিভীষিকাময় বাস্তবতা একই সাথে চিত্রিত হয়। *আফটারলাইভসে* জার্মান-শিবিরে নির্মম অত্যাচারের পর আফিয়াকে কেন্দ্র করে হামজার জীবনের নতুন তরঙ্গময়তা পাঠককে 'ক্যাথারসিসে'র আনন্দ দেয়। জার্মান পক্ষে বর্বর ফেল্ডওয়েবেলের পাশাপাশি ওবারলিউটেন্ট, প্যাস্টর, ফারু প্যাস্টরের মতো অফিসারদের মানবিক সৌন্দর্য আমাদের মোহিত করে। প্রভুর ঔদার্যের সূত্রে ইলিয়াসের মধ্যে যে জার্মান-ভক্তি লক্ষ করা যায় তা অবিশ্বাস্য মনে হয় না পাঠকের কাছে। কারণ, 'টিপিকাল' চরিত্রের পাশাপাশি কিছু ব্যতিক্রমী চরিত্র উপন্যাসকে আরো বস্তুনিষ্ঠ করে তোলে। একজন সত্যসন্ধিৎসু ঔপন্যাসিকের পক্ষেই এ যথার্থতা সৃষ্টি সম্ভব। পর্বতশিখরে আরোহণ না করলে যেমন সানুদেশের গুল্মলতার সবুজের তারতম্য অনুধাবন সম্ভব নয়, তেমনি অভিজ্ঞতা ও বোধের উচ্চতায় না পৌছলে সাহিত্যে এ অভূতপূর্ব ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। তাই গুরনাহ একাধিক পরিচ্ছেদ ও অধ্যায়ের সমন্বয়ে 'ন্যারেটিভ'ভাবে তাঁর উপন্যাস বয়ান করলেও তাঁকে কেবল গল্পকথক বললে ভুল হবে। আফ্রিকান সাহিত্যিকদের অনেকেই কেবল ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন করেছেন তাদের জনপদকে। গুরনাহ নির্মোহ দৃষ্টিতে, ভালো-মন্দ মিলিয়ে নিজস্ব স্বরূপে আফ্রিকাকে এঁকেছেন তাঁর উপন্যাসে।

৪.

প্যারাডাইস এবং *আফটারলাইভস* কেবল আখ্যান-পরম্পরায় নয় বরং ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিকভাবেও পরস্পরিত। পূর্ব-আফ্রিকার ইতিহাস জটিল ও দীর্ঘ। মৌসুমি বাণিজ্যের সূত্রে আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের সাথে যুগ-যুগ ধরে সংযোগ ছিল আরব-ওমানি-পারসি-ভারতীয় এবং কিছু ইউরোপীয় বণিকদের। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত এ আরব-ওমানি-পারসি বণিকেরা আফ্রিকার পূর্বপ্রান্তে কেবল দাস-ব্যবসা বা তাদের অন্য ব্যবসা-বাণিজ্যকেই বিস্তৃত করেনি, বসবাস ও যাতায়াতসূত্রে তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, রীতি-রেওয়াজ দিয়েও স্বভাবতই প্রভাবিত করেছিল এ অপরিচিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে। গুরনাহর জন্ম এবং বেড়ে ওঠা ছিল পূর্ব-আফ্রিকার বিভিন্ন জাতির

বৈচিত্র্যময় এ লীলাভূমিতে। কিছু পরিমাণে আরব-রক্ত মিশ্রিত এ আফ্রিকার বান্টু জাতির ভাষা সোয়াহিলি (Alen, 1993: 8)। আরবি শব্দ 'সোয়াহিল' থেকে সোয়াহিলি শব্দটি প্রচলিত হয়। সোয়াহিল অর্থ সমুদ্র-কূল (Chris, 2003 :76)। তাছাড়াও সেখানে ছিল নানা আদিবাসী গোত্রের ভাষা, রীতি ও বিশ্বাসের ভিন্নতা। বহু কাল ধরে বাণিজ্য ও উপনিবেশসূত্রে আরবি-ফারসি-ওলন্দাজ-জার্মান-ইংরেজি প্রভৃতি বহু ভাষার মিশ্রণে আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের ভাষা প্রকৃতপক্ষে হয়ে যায় একটি 'লিঙ্গুয়া-ফ্রাঙ্কা'। গুরনাহ তাঁর উপন্যাসে পরোক্ষভাবে এ প্রায়োগিক ভাষার উল্লেখ করলেও সংলাপে তার ব্যবহার প্রায় করেননি। তবে, তিনি মিশ্রভাষার নানা শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন, *প্যারাডাইস* উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদে ইউসুফের বাবা শহরের ভারতীয় বিধর্মীদের সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে 'ওয়াশেনজি' শব্দটি ব্যবহার করে। মাংস আর শিম দিয়ে ইউসুফের মায়ের রান্না করা ঐতিহ্যবাহী খাবারটির নাম 'মানডাজি'। ইউসুফ কাওয়া থেকে আজিজ চাচার সাথে তানজানিকায় গেলে সেখানে প্রচুর আরবি ভাষার ব্যবহার তাকে আগন্তুক করে তোলে। খলিল স্বচ্ছন্দ ছিল আরবি এবং কিসোয়াহিলিতে। খলিল ইউসুফকে ডাকত 'কিফা উরুঙ্গো' নামে, যার অর্থ জিন্দা লাশ। তানজানিকা আরব-ওমানি-ভারতীয়-গ্রিক-ইউরোপীয় প্রভৃতি নানা জাতির মিশ্র আবাসস্থল। ফলে, সেখানে ভাষা ও সংস্কৃতিগত বৈচিত্র্য স্বাভাবিক। ওমানীয় পরিবারগুলোর শিশুদের স্থানীয়দের সাথে না মিশতে দেয়া, ইউরোপীয় খামারিদের উন্নাসিকতা, ভারতীয় অংশে জাঁকজমকপূর্ণ বিবাহ অনুষ্ঠান এবং সমুচা-লাড্ডু-হালুয়া-বাদাম প্রভৃতি খাদ্য-সংস্কৃতি, অর্ধেক গ্রিক-অর্ধেক ইন্ডিয়ান ট্রাকচালক বাচুসের গান, রমজান ও সিয়াম পালন তানজানিয়ার মিশ্র সংস্কৃতিকে উপস্থাপন করে। নিষিদ্ধ পণ্য অর্থে 'ম্যাগেনডো', সুন্দর বালক অর্থে 'কিজানা মজুরি', স্বাগত জানাতে 'মোহন সিধোয়া, হুজাম্বো বোয়ানা ওয়াঙ্গু' অর্থাৎ, আশা করি তোমার শরীর ভালো, তোমার ছেলে-মেয়ে, তাদের মা ভালো আছে কিংবা 'কারিবু বোয়ানা আজিজ' অর্থাৎ ব্যবসাপাতি কেমন চলছে?, 'সিকুহিতিমু' অর্থাৎ মনে হয় পড়তে পারব না,'সিকুফানিয়েনি মাসখারা' অর্থাৎ তোমাদের সাথে মশকরা করছি না – এরূপ প্রচুর সোহায়িলি শব্দ ও বাক্য প্রয়োগ করেছেন গুরনাহ্ তাঁর *প্যারাডাইসে।* 'মাশাআল্লাহ', 'আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিউল আলমিন', 'অস্তাগফিরুল্লাহ্', 'খতম' প্রভৃতি আরবি শব্দের ব্যবহার এবং বিভিন্ন প্রসঙ্গে জিব্রাইল, নুহ, ইউসুফ প্রভৃতি নবি ও জিনদের গল্প, বেহেশত-দোজখের কল্পনা প্রভৃতি এই উপন্যাসে মুসলিম আবহ তৈরি করে। কালাসিঙ্গার সূত্রে ঋষির সঙ্গে প্রেমের দেবতা মদনের লড়াই, রূপবান বীরের সঙ্গে গোঁফওয়ালা শয়তানের ভারতীয় গল্পের সাথে পরিচিত হয় আফ্রিকান তরুণ ইউসুফ। *প্যারাডাইসে* বিভিন্ন গোত্রের সুলতানদের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে অনুবাদক নিউন্ডো মধ্যস্থতা করায় গোত্রসমূহের ভাষা উপন্যাসে প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহৃত হয়নি। এ উপন্যাসে ইউরোপীয় শব্দও সরাসরি ব্যবহৃত হয়নি, কারণ, কিসোয়াহিলি জানা তাদের আসকারি সৈন্য এবং নিউন্ডো মিলে সৈয়দ সাহেব, চাটু ও জার্মান অফিসারের ভেতরের ভাষাগত ব্যবধান দূর করে।

পূর্ব-আফ্রিকায় ১৮৮৪ থেকে ১৯১৮ সালের শেষ পর্যন্ত প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর ধরে জার্মানির ঔপনিবেশিক শাসন চলে। ফলে, এই উপনিবেশসূত্রে সহজেই জার্মান ভাষার মিশ্রণ ঘটে কিসোয়াহিলি ভাষার সাথে। *আফটারলাইভস* উপন্যাসের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হয় আসকারি সৈন্যদের দিয়ে জার্মান ভাষায় একটি রণসংগীত গাওয়ানোর মধ্য দিয়ে। আফ্রিকান আসকারিদের জন্য জার্মানদের এই সম্মোহন-বুলি গুরনাহ জার্মান ভাষাতেই উপস্থাপন করেন ইংরেজি অনুবাদসহ –

> মোরা জার্মানে যোগ দিয়েছি,
> মোরা প্রস্তুত!
> মোরা মদাচি-সরকার-সৈন্য,
> মোরা প্রস্তুত!
> মোরা তার তরে লড়ব নির্ভীক,
> ভয়হীন!
> মোরা করব ত্রস্ত সব শত্রুদের, দেব ভয়ে ভরে তাহাদের
> ভয়গ্রস্ত! (AbdulRazak, 2021: 52)

নিষ্ঠ, সত্যসন্ধিৎসু এবং দায়বদ্ধ হলেই একজন ঔপন্যাসিক অনুবাদের এ ক্লেশ স্বীকার করেন। জার্মান অফিসারদের সাথে আসকারিদের সংলাপ বিনিময়ের সূত্রে গুরনাহ এ উপন্যাসে প্রচুর জার্মান ও সোয়াহিলি শব্দ ব্যবহার করেন। স্কুজট্রেপগুলোতে সোয়াহিলি ছাড়াও আরবি, কিনইয়ামওজি এবং জার্মান ভাষার মিশ্র একটি প্রায়োগিক ভাষার প্রচলন ছিল (AbdulRazak, 2021: 60)। যেমন: বোমা ক্যাম্পে একজন গার্ড শৌচাগার পরিষ্কাররত আসকারিদের উদ্দেশ্যে বলে – 'Boma la mzungu', 'Kilu kitu safi. Hataki mavi kishenzi hapa.' অর্থাৎ 'এটা মজুঙ্গুর ক্যাম্প। এখানে সবকিছু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সে বোমার মধ্যে তোমাদের মল দেখতে চায় না (AbdulRazak, 2021: 54)। ওবারলিউটনেন্ট যখন হামজাকে জার্মান ভাষা শেখাতে শুরু করে, তখন তাকে দিয়ে প্রথমে বলায়—'Mein Name ist Hamza. Sie sind herzlich willkommen in meinem Land' অর্থাৎ আমার নাম হামজা। আপনাকে আমাদের দেশে স্বাগত জানাই' (AbdulRazak, 2021: 78)। বারো পরিচ্ছেদে মিজি সুলেমানি কৌতুক করে হামজার কাছে জানতে চায়, 'তুমি অনেক সন্তানাদি দ্বারা পূর্ণ থাক। তুমি কি এটা জার্মান ভাষায় বলতে পারবে?'। হামজা প্রত্যুত্তরে চট করে জার্মান ভাষায় বলে – 'Mogest du mit vielen kindern gesegnet sein' (AbdulRazak, 2021: 214)। আফিয়াকে উপহার দেয়া হামজার অনুবাদ করা শিলারের কবিতা, ফারু প্যাস্টরকে লেখা তার জার্মান ভাষার চিঠি ও তার প্রত্যুত্তর, হেনরিক হাইনের কবিতার অনুষঙ্গে জার্মান ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির একটি আবহ সৃষ্টি করেছেন গুরনাহ তাঁর *আফটারলাইভস* উপন্যাসে। জার্মান ছাড়াও বিভিন্ন অনুপাতে আরবি, ইংরেজি ও কিসোয়াহিলি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এ উপন্যাসে। উপন্যাসে

ভাষা-প্রয়োগের ক্ষেত্রে গুরনাহকে রীতিমত গবেষণা করতে হয়েছে। ভাষার প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ প্রয়োগ, বিদেশি শব্দের উদ্ধরণ কিংবা বোধগম্যরূপে তার ব্যাখ্যা, শব্দের টোন এবং প্রক্ষেপণের দিকে লক্ষ রেখে সংলাপ এবং বর্ণনার প্রক্রিয়াটি সত্যিই দুরূহ। যে মিশ্রচেতনায় সমুদ্রপারের মানুষগুলো হাজার-হাজার বছর ধরে লালিত, মিশ্র ভাষায় কথা বলে অভ্যস্ত, তাকে ইংরেজি ভাষায় প্রাণবন্ত করে তোলা সহজ নয়। জার্মান-শিবিরের চিত্র আঁকতে গিয়ে সোহায়িলি ও জার্মান ভাষার মধ্যস্থতা এবং বর্ণনার মাধ্যমে সেই বিশেষ আবহটিকে প্রকাশ করা যে-কোনো লেখকের পক্ষে সম্ভব নয়। শৈশব থেকে মিশ্র কিসোয়াহিলিতে অভ্যস্ত গুরনাহ উপনিবেশসূত্রে জার্মান এবং অভিবাসসূত্রে ইংরেজিতে অভ্যস্ত হওয়ায় এবং একটি বৈশ্বিক ব্যক্তিত্ব অর্জন করায় তাঁর পক্ষে এই ভাষাগত সমন্বয় সম্ভবপর ছিল।

প্যারাডাইস ও *আফটারলাইভস* দুটি উপন্যাসই পূর্ব-আফ্রিকার সমুদ্র-উপকূলে তানজানিয়া শহরকে কেন্দ্র করে রচিত। ভিন্ন ভিন্ন স্থানিক পটে নানা ঘটনা আবর্তিত হলেও সে সব পথ শেষ পর্যন্ত এসে মিলেছে তানজানিয়ার বৈচিত্র্যময় মিশ্র জনপদে। *প্যারাডাইসে* কাফেলা-দল নানা পথে কিলিমাঞ্জারোর পাদদেশের শহরগুলো থেকে ঘুরে এলেও তানজানিয়ায় সৈয়দ সাহেবের বাড়িই তাদের মূল গন্তব্য। যুদ্ধ-বিগ্রহ, আফিয়ার নিগ্রহ, ইলিয়াসের জার্মান অভিবাসসূত্রে নানা স্থানের উল্লেখ থাকলেও *আফটারলাইভসের* মূল পটভূমি আবর্তিত হয় তানজানিয়ার সেই একই স্থানকে কেন্দ্র করে। যে জায়গা থেকে হামজা একদিন নিরুদ্দেশ হয়েছিল, ঠিক সেই একই স্থান থেকে অন্তর্হিত হয়েছিল ইউসুফ। ইউসুফ এবং হামজা দুজনের পিতাই ঋণের দায়ে দুই আরব বণিকের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল তাদের। দুজনেরই ছিল কাফেলা-যাত্রার অভিজ্ঞতা। *প্যারাডাইস* আফ্রিকায় উপনিবেশ-পূর্ববর্তী আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার সাক্ষী; অপরদিকে *আফটারলাইভস* উপনিবেশ ও তৎপরবর্তী সময়ের আখ্যান। *প্যারাডাইস* একটি রোমাঞ্চকর অভিযাত্রার মতো করে বর্ণিত। এ উপন্যাসের ভূদৃশ্যের বর্ণনা, চিত্রময়তা, বিচিত্র চরিত্রায়ণ, পোশাক-খাবার-ধর্ম-কৃত্যের নানা সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা, এবং মিশ্র ভাষাজগৎ পাঠককে চমৎকৃত করে। জীবনের সত্য ও রূঢ় বাস্তবতাকে ঔপন্যাসিক গল্পের ছলে উপস্থাপন করেছেন এ উপন্যাসে। ফলে, *হার্ট অফ ডার্কনেস* কিংবা অন্য ভ্রমণ-সাহিত্যের সাথে *প্যারাডাইসের* পার্থক্য বিস্তর। *আফটারলাইভস* ব্যাপ্তির দিক থেকে প্রায় মহাকাব্যিক। আধুনিক উপন্যাস হওয়া সত্ত্বেও এটি দীর্ঘায়তনিক, পৃথুল ও আদি-মধ্য-অন্ত সমন্বিত। জাতীয়-আন্তর্জাতিক ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলি নিয়ে যে-সব উপ-আখ্যান এবং চরিত্রাবলি গুরনাহ এখানে সৃষ্টি করেন, সেগুলোকে এক অভিনব ঔচিত্যবোধে তিনি পরস্পরিত করেন এবং সম্পূর্ণতা দেন। বৃক্ষ যেমন তার পত্র-শাখা-কাণ্ড-বল্কল মূলের সাথে বেঁধে রাখে, গুরনাহর এই মহীরূহ সাহিত্যকর্মটি তেমনি বিস্তৃত হয়েও মূলানুগ ও স্বয়ম্ভু, তেমনি প্রাচীন ও পুনর্নব। *আফটারলাইভস* এবং *প্যারাডাইসের* মধ্য দিয়ে কিসোয়াহিলি ভাষা ও সংস্কৃতিও একটি সংহতি অর্জন করে। সুতরাং, আবদুলরাজাক

গুরনাহর এ উপন্যাসজোড়া পরস্পর-সন্নিহিত, অঙ্গাঙ্গি এবং সমাবিদ্ধ। জীবনাভিজ্ঞতা ও শিল্প-নিরীক্ষার সারাৎসার গুরণাহর এ দুটি উপন্যাস। সমাজ-দায়বদ্ধতা ও ইতিহাসের শৈল্পিক অন্তর্বয়নে গুরনাহ অপ্রতিদ্বন্দ্বী এক কথাশিল্পী।

টীকা

জানজিবার বিপ্লব: ১৯৬৪ সালে আরব-সুলতান ও তার সরকার উৎখাতের উদ্দেশ্যে পূর্ব-আফ্রিকার জানজিবারে সংঘটিত সহিংস বিপ্লব। তানজানিয়ার সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ সশস্ত্র বিপ্লীদের হাতে এ সময় আফ্রিকায় নিহত হয় হাজার-হাজার আরব এবং ভারতীয়, যারা এতদিন আফ্রিকার রাষ্ট্র-ক্ষমতা, অর্থনীতি ও বাণিজ্যকে কব্জা করে ছিল।

তথ্যপঞ্জি

আবদুলরাজাক গুরনাহ, ২০২২। *প্যারাডাইস*, মলয় পাঁড়ে অনূদিত, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা।

মুহম্মদ এনামুল হক [সম্পাদক], ২০০৯। *ইউসুফ-জোলেখা*, শাহ মুহম্মদ সগীর রচিত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

AbdulRazak Gurnah, 2001. *By the Sea*, The New Press, New York.

AbdulRazak Gurnah, 2021. *Afterlives*, Bloomsbury Publishing, London.

Alen James De Vere, 1993. *Swahili Origin, Swahili Culture & The Shungwaya Phenomenon*, Ohio University Press, U.S.A.

Chris Peers, 2003. *Armies of Nineteenth Century : Africa*, Foundry Publications, U.K.

Fowzia Mustafa, 2015. 'Gurnah and Naipal: Intersection of *Paradise* and *A Blend in the River*', *Twentieth Century Literature*, Vol.61, No.2, Duke University Press.

Gijsbert Oonk, 2005. 'Gujarati business communities in East Africa: success and failure stories', *Economic and Political Weekly*, vol. 40, No. 20, May 14-20, India.

Jacob J.V, 2009. 'Trading places in AbdulRazak Gurnah's *Paradise*', *English Studies in Africa*, Vol.52/ Issue: 2, Tailor and Francis Group.

Marsh Zoe & Kingsnorth G.W, 1972. *A History of East Africa*, Cambridge University Press, London.

Kwame Nkrumah, 1966. *Neo-Colonialism: The last stage of Imperialism*, International Publishers, New York.

Russell West-Pavlov, 2018. *Eastern African Literatures: Towards an Aesthetics of Proximity*, Oxford University Press, U.K.